Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত বিপ্লবী সূত্রগুলোকে অর্থহীন জপমন্ত্রের মত মুখস্থ করে আউড়ে চলা এবং প্রতিপদে বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নামে অতি বামপন্থার দিকে গিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রবণতা তারই নাম ডগ্‌মাটিজম-সেক্‌টারিয়ানিজম।

—ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লব ১
দেশ বিদেশ ২
ভারতকে সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে ৩
গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ড ৪
নয়াউদারবাদে উন্নয়ন একটি পণ্য ৫
আর এস পি'র কর্মীসভা ৬
পশ্চিমবঙ্গ কেমন আছে? ৭
এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না... ৮

ক

68th Year 37th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 6th Nov. 2021

ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় বর্তমান পরিস্থিতি

বছরের পর বছর চলে যায়। ঘুরে ঘুরে আসে ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠার সেই দুনিয়া কাঁপানো নভেম্বরের দিনগুলি। শুধু গণ অভ্যুত্থানের পর্বে রাশিয়ার অস্থায়ী পুঁজিবাদী সরকারের উৎখাত এবং বলশেভিক পার্টি (পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির) সহায়তায় খেটে খাওয়া মানুষের শাসনে সমাজতান্ত্রিক সমাজ রূপান্তরের অনুশীলন নয়। নভেম্বরের প্রস্তুতি যে পূর্ববর্তী তিন চার দশক ধরে একদিকে জার শাসিত অভিজাততন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, রুদ্ধ গণতন্ত্রের আবহে দুনিয়ার পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সামন্ত শাসকদের সমঝোতায় রাশিয়ায় কৃষি সমবায় ভেঙে পুঁজিবাদের ভিত্তি প্রস্তুতির প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে গড়ে উঠছিল।

সেই ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ যেন বর্তমানে আরও বেশি মূল্যবান তথা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, একদিকে উগ্র ইহুদী বিদ্বেষ, অবক্ষয়প্রাপ্ত গোড়া খৃষ্টীয় মূল্যবোধ, সমাজের অধঃপতিত জনসমষ্টিকে সংগঠিত করে ব্ল্যাক হান্ড্রডের দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ বেকারত্বের আগ্রাসনে কোটি কোটি মানুষের অসহনীয় জীবনযন্ত্রণার মধ্যেও সংগঠিত বিপ্লবী শক্তির উদ্ভবের কাহিনী, সারা পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের এই প্রতিক্রিয়ার কালে অবশ্যই অনুপ্রেরণা জোগাবে।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের কাঠামোগত সংকটে একদিকে অধিকাংশ মানুষের দারিদ্র ক্ষুধা বঞ্চনা বেকারত্বের পাশাপাশি বাড়ছে প্রাকৃতিক সম্পদ ও শক্তির অপব্যয় ও উদগ্র মুনাফার লালসাঘটিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত কারণে অসহায় মানুষের চরম ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি। একের পর এক ভাইরাস ও মারাত্মক জীবাণুর সংক্রমণে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষের রোগযন্ত্রণা ও মৃত্যু। অপরদিকে বাড়ছে আর্থসামাজিক বৈষম্য চূড়ান্ত হারে।

সাম্প্রতিক কালে উপর্যুপরি দেশে দেশে কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি করোনা ভাইরাস জনিত মহামারী বিশ্বব্যাপী শুধু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কাঠামোগত সংকটাকেই নগ্ন করেনি। নগ্ন করেছে নয়াউদারবাদী

১৯১৭ আসুক ফিরে

শাসনব্যবস্থায় রাক্ষুসে সর্বগ্রাসী সামাজিক-মানবিক মূল্যবোধকেও। যখন সংক্রমণ রুখতে গিয়ে মানুষে মানুষে শারীরিক দূরত্ব নির্মাণ করা হচ্ছে শাসকের মর্জিমাফিক, যখন জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার উপরিকাঠামো ভেঙে পড়ার চাপে মারা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, তখনও দেশে দেশে শাসকের রাজনীতি ধর্মসম্প্রদায় বর্ণবৈষম্যের জালে মানবসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দি করে রেখে চলছে চরম অমানবিক নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ার দাপাদাপি। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মুখোশটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে মিশে গেছে পুঁজিবাদী কাঠামোর বিচারব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সহ স্বশাসিত তথাকথিত গণতন্ত্রের পাহারাদার সংস্থাসমূহ।

রাশিয়ায় নভেম্বরের কাহিনী নয়, ফ্রান্সের প্যারী কমিউনের ইতিহাসও শুধু নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে, তা হাঙ্গেরীতে হোক আর জার্মানী, ইতালীতেই হোক, ঔপনিবেশিক জোয়াল থেকে মুক্ত হতে চিন ভারত সহ আফ্রিকা এশিয়ার দেশে দেশে গণসংগ্রামের-গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস রচিত হয়েছে অসংখ্য মানুষের রক্তে ঘামে জীবন যন্ত্রণায়। সংগঠিত চেতনাঋদ্ধ গণঅভ্যুত্থানে ও সমাজ বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই ছায়া ফেলে বর্তমানে মানব সমাজের চরম যন্ত্রণা নিপীড়ন শোষণ থেকে মুক্তির ইচ্ছার উপর, বিপ্লবাদিতার উপর, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড নির্মাণের উপর।

প্রসঙ্গত বিগত শতকের নয়ের দশকের পর থেকে একথা অনস্বীকার্য যে সারা পৃথিবীর দক্ষিণপন্থী দলগুলি বিভিন্ন কৌশলে কর্পোরেট অর্থের সহায়তায়, আধুনিক প্রচার মাধ্যমের উপর খবরদারি করে আর শ্রমশক্তির একাংশকে বাতিল তথা বাড়তি করে ঠেলার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বিভেদপন্থা (অভিবাসী, সম্প্রদায়, বর্ণবৈষম্য)-কে ঢাল করে সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসনক্ষমতা দখল করছে। দক্ষিণপন্থী জনপ্রিয়তা নির্মাণ থেকে শুরু করে উদার বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পাহারাদার সংস্থাগুলিকে শ্রেণিস্বার্থে নিপীড়নের জন্য ব্যবহার করে হেজিমনি (সর্বব্যাপী আধিপত্য) বজায় রাখছে। ব্রাজিলে বোলসোনারো, তুর্কীতে এর্ডোয়ান, ভারতে নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ মানবসভ্যতা বিনাশী আগ্রাসী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মুখ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

সুতরাং বিপ্লবী দল ও খেটে খাওয়া মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণঅভ্যুত্থানের প্রাসঙ্গিকতা অন্বেষণ করতে হলে মানবসমাজের প্রতিটি ঐতিহাসিক সংগ্রামের সার্থকতা-ব্যর্থতা, পরিবেশ সাপেক্ষ রণনীতি রণকৌশল ইত্যাদি বিশ্লেষণই হবে আজ এযুগের সমাজ বদলের কর্মী ও সংগঠনের মূল পাথেয়।

মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইস্তেহারেই আজ থেকে প্রায় পৌনে দুশ বছর আগে ১৮৪৮ সালে পুঁজিবাদের আন্তর্জাতিক চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন। সোজা কথায় উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণের এই চরিত্র দুনিয়া জুড়ে এক ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। শুধু জাতিরাষ্ট্রের বিবর্তনে দেশে দেশে তার ধরন আলাদা। সেই ধরনের পার্থক্য ও জাতিরাষ্ট্রের উপর বাজারের হেজিমনির জন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষও ঘটতে থাকে।

এসব সত্ত্বেও কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ঘোষণা করেছিল যে, শ্রম বিভাজনের এলাকা ও ব্যাপ্তির পার্থক্য সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষ তার অভিজ্ঞতা ও শোষণের প্রেক্ষিতে নিজের শ্রেণিসত্তার আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা অনুধাবন করতে সক্ষম। দেশে দেশে জাতিরাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে পুঁজিবাদকে উৎখাত করাই হবে শ্রমজীবী শ্রেণির আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা।

পরবর্তীকালে ১৮৪৮-১৮৫৭ -১৮৬৪ সাল এবং বিশেষ করে ১৮৭১ সালে প্যারী কমিউনের মত প্রথম সাম্যবাদী সমাজের অঙ্কুর ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং পরিণত হওয়ার আগেই ধ্বংস হওয়ার অভিজ্ঞতায় পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক সংকটে খেটে খাওয়া মানুষের ভূমিকা সম্বন্ধে বাস্তব ছবি তুলে ধরেন কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস। ইতিহাস মানুষ নিজেরাই রচনা করে। কিন্তু নিজেদের প্রত্যাশামত তা ঘটে না। নিজেরা শর্ত নির্মাণ করে ইতিহাসকে চালিত করবে, তা সর্বদা সম্ভব হয় না। কিন্তু ইতিহাসের গতির প্রতি লক্ষ রেখেই সামাজিক মানুষকে যাত্রা করতে হয়। অতীতে ঘটে চলা ঘটনাগুলি যেভাবে বর্তমানকে প্রভাবিত করে তার মুখোমুখি হতে হয়। সচেতন মানব সমাজই বাস্তব পরিস্থিতির দ্বন্দ্বসংঘাত সমাজ রূপায়ণের সংগঠিত শক্তির গুণ ও চাহিদাকে পাথেয় করে সমাজ বদলের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতি পর্বে কম. লেনিনের নেতৃত্বে আর এস ডি এল পি'র বলশেভিক অংশ ইতিহাসের প্রতিটি মোড়ে মার্কস-এঙ্গেলসের বিপ্লবাদিতাঋদ্ধ দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে বাস্তব রণনীতি রণকৌশলের মিলন ঘটানোর প্রয়াস করেছে। সমাজ বিকাশের বিশেষ স্তরে উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের সংঘাতের চরম মুহূর্তটিকে অন্বেষণ করে উভয় উপাদানের পারস্পরিক ধ্বংসের মুহূর্তে অনুঘটকের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতাকেই বিপ্লবীর লক্ষ্য বলে মনে করতেন কার্ল মার্কস। বাস্তব অবস্থা অনুরূপ হলে আপনা থেকেই বিপ্লব হয় না। আবার ঐকান্তিক বৈপ্লবিক প্রেরণা ও দুঃসাহস থাকলেও বিপ্লব হবে না।

পূর্বে উল্লিখিত বৈপ্লবিক মুহূর্তের অন্বেষণ ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ও রণকৌশলই সমাজবদলের চাবিকাঠি। প্রস্তুতির কালে বিপ্লবী দলের ভূমিকা কোনো মুহূর্তের সচেতন শ্রমজীবী শ্রেণির সংগঠন, শ্রেণি চেতনা ও সমাজ বদলের কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শ্রমিক শ্রেণির স্বমুক্তির চেতনাই যে মূল

এরপর ৪-এর পাতায়

দেশে বিদেশে

স্বৈরাচারীদের মুখোশ খুলবে কে?

ইদানীং বিজেপি'র বিরুদ্ধে বিরোধীদের জমজমাট সমাবেশ জাতীয় রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হওয়ার দাবি রাখতে পারে। পেগাসাস বিতর্কে সংসদে কেন হইচই হলেও শাসকদলের মধ্যে কিন্তু বিশেষ হেলদোল দেখা যায় নি। বিজেপি'র পক্ষে সরকারের কাজ হাসিল করতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। লোকসভা ও রাজ্যসভার বিগত অধিবেশনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমবেশি ২৫ শতাংশ কাজ হলেও এরই মধ্যে সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি ন্যূনতম মান্যতা প্রায় না দিয়েই বেশ কতকগুলি বিল পাশ করানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষায় ধর্মঘট নিষিদ্ধকারী Essential Defence Service Bill, বিতর্কিত বিমা আইন ও এই অধিবেশনেই পাশ করানো হয়েছে। পেগাসাস বিষয়ে সাংসদদের কণ্ঠরোধ ফ্যাসিবাদী প্রবণতার উল্লেখযোগ্য এক নিদর্শন। মোদী জমানায় ফ্যাসিবাদী ও স্বৈরাচারের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ কমে আসছে। এদেশে ফ্যাসিবাদকে রুখতে হলে স্বৈরতান্ত্রিক সমস্ত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জোট নির্বিশেষে বিরোধী শক্তিগুলির প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ে তুলতে হবে এবং নিজেদের ক্ষমতাসীন রাজ্যে স্বৈরতান্ত্রিক আইনগুলি ব্যবহার না করে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। বাস্তবে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি বহু রাজ্যেই দানবীয় ইউ এ পি এ, সিডিশন আইন বা মানুষের কণ্ঠরোধকারী অন্যান্য আইনগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এসব প্রশ্নের ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকারগুলির কোনও কুণ্ঠা দেখা যায় নি। মাথায় রাখা প্রয়োজন নিজ নিজ শাসনাধীন রাজ্যগুলিতে স্বৈরাচারী ভূমিকা গ্রহণ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারা দেশে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা বা সফল করা বস্তুত অসম্ভব।

কিউবার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

এবছরের জুলাই মাসে কিউবার রাজধানী হাভানা সহ অন্যান্য বহু শহরে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ার বুর্জোয়া গণমাধ্যমগুলি স্বভাবতই বেশ উল্লসিত এবং এই ঘটনাকে কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির নিশ্চিত শাসনের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান হিসেবে প্রচার করছে। রাজনৈতিক মহল এই ঘটনায় দুই ভাগে বিভক্ত, একদল এই ঘটনাকে সি আই এ প্রযোজিত প্রতিবিপ্লবী বিক্ষোভ আন্দোলন বলে অভিহিত করেছে, আর এক দল দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দিয়েছে। অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া অর্থনৈতিক অবরোধ কিউবার অধিকাংশ সমস্যার মূলে রয়েছে। জীবনধারণের সমস্ত মৌলিক উপকরণের ঘাটতি। কারণ, এই দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক অবরোধ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর কিউবার অর্থনৈতিক সঙ্কট বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে কিউবার অর্থনৈতিক অবস্থায় কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারি উদ্যোগে শিল্প এবং খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশি বিনিয়োগ আসতে শুরু করে। তদুপরি ভেনেজুয়েলা সরকারের ভর্তুকি যুক্ত তেল রপ্তানির ফলে কিউবা কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক অবস্থায় আছে। তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক দেশের জনগণকে আদর্শগতভাবে পুঁজিবাদের প্রতি আকৃষ্ট করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ওবামা জমানায় অর্থনৈতিক অবরোধ কিছুটা শিথিল হয় এবং কিউবায় মার্কিন পুঁজির বিনিয়োগও শুরু হয়—পরে অবশ্য ট্রাম্প জমানায় এই নীতির পরিবর্তনও হয় এবং কিউবার উদার অর্থনৈতিক ফাঁস আরও কঠোর হয়। কোভিড অতিমারি কিউবার আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস এর ফলে পর্যটন শিল্পের উপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসে। ফলে গত দু'বছরে সাধারণ মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠেছে। বন্ধ ব্যবসা, বাণিজ্য, তেলের ব্যাপক ঘাটতির ফলে কিউবার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নামছে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবরোধ ছাড়াও, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রশাসনিক অচলায়তন কিউবা রাষ্ট্রের এক প্রধান সমস্যা। বিপ্লবের সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশীয় বুর্জোয়ারা উচ্ছেদ হলেও, কৃষক ও শ্রমিকদের দ্বারা পরিকল্পিত প্রলেতারীয় গণতন্ত্রের যথাযথ অনুশীলন করতে কিউবা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছিল এক আমলাতান্ত্রিক শ্রমিক রাষ্ট্রের, যার প্রধান কাজ ছিল বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রে, রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা পত্তন করা।

একটি ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ফিদেলের আর্থিক নীতিমালার প্রায় অসম্ভব প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য কিউবার আমলাতন্ত্র বাধ্য হয়েছিল দেশের অর্থনীতিকে বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে। বৃদ্ধি পেয়েছে সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা, ফলে কিউবাকে চড়া দামও দিতে হয়েছে। বৈষম্য বেড়েছে এবং বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সামাজিক সুফলগুলিকেও বহুলাংশে জলাঞ্জলি দিতে হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক অবরোধ, সামাজিক সম্পদের ওপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, এ কথা বললে সম্ভবত অতিশয়োক্তি হবে না। পুঁজিবাদের পুনরুত্থানের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি হতে পারে, দেশে গণতন্ত্রের আবহাওয়া ফিরে আসতে পারে, এমন এক ধারণা জনমানসে গেড়ে বসতে চলেছে। কিউবায় বাড়তে থাকা সামাজিক বৈষম্য এবং দারিদ্রের পিছনে যেমন অর্থনৈতিক অবরোধের ভূমিকার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। কিউবার সংকটের পিছনে যে আমলাতন্ত্রের নেতিবাচক ভূমিকা রয়েছে, তাকে উচ্ছেদ করে কিউবার শ্রমজীবী মানুষকে নিজের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার দখল নিতে হবে। কিউবায় কমিউনিস্ট পার্টির নামে আমলাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রী শাসনের অবসান ঘটাতে হবে। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, কিউবার মহান বিপ্লবের অবমূল্যায়ন এই লেখার উদ্দেশ্য নয়, মার্কিন সামাজ্যবাদের দীর্ঘ অবরোধ সত্ত্বেও কিউবার সমাজতন্ত্রের টিকে থাকাটা তুচ্ছ করা যায় না, তবে কিউবা যে ভাল নেই, সেটাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী প্রসঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরাট ঢাকঢোল পেটানো স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মর্মবস্তু হল স্বাস্থ্য পরিষেবার বরাদ্দ করার টাকার প্রধান অংশ বিমার প্রিমিয়াম হিসাবে বিমা কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দেওয়া। এই টাকাই ঘুর পথে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পুষ্ট করবে। **এই বরাদ্দ টাকা সরাসরি খরচ করে ত্রিস্তর সরকারি স্বাস্থ্য কাঠামোর উন্নতির কাজে যদি লাগাতেন তাহলে রাজ্যের জনসাধারণ বেশি উপকৃত হত।**

২০১৭ সালে চালু হওয়া স্বাস্থ্যসাথীর উপভোক্তা ছিলেন রাজ্যের দেড় কোটি মানুষ। পরে তা বাড়িয়ে আড়াই কোটি করা হয়। বিমার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়। বর্তমান বিধানসভার ভোটের আগে ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যের সব মানুষই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা যাই হোক না কেন, পরিবারের সদস্য সংখ্যার কোনও উর্দ্ধসীমা নেই। সবাই সুবিধা পাবে। **প্রসঙ্গত, যে সব দেশে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিমা ব্যবস্থার প্রাধান্য রয়েছে, সে সব দেশে সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মান আশানুরূপ নয়। মার্কিন দেশের উদাহরণ দেখে তা ভালো বোঝা যায়।** বিমা ব্যবস্থার দেশে অকারণ চিকিৎসা ব্যয় হতে বাধ্য, সেখানে চিকিৎসার অনেকটা খরচ রোগীর নিজের পকেট থেকেই দিতে হয়। বিমা ব্যবস্থায় এই রকম খরচের পরিমাণ কমানো সম্ভব নয়।

নানা কিসিমের বিমা ব্যবস্থায় আউটডোর রোগীদের চিকিৎসা খরচ পাওয়া যায় না। তথ্য বলছে চিকিৎসার যে খরচ রোগীরা পকেট থেকে দেন, তার শতকরা ৬৩ ভাগ করতে হয় আউটডোর চিকিৎসার জন্য। অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ে ৩৭ শতাংশ বিমা ব্যবস্থার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেস ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করা হয়েছে। সরকারের আয় বাড়বে ১১,০০০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১০ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হবে।

আয়ুষ্মান ভারতের মতই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প ও প্রকৃত অর্থে জনগণের করের টাকা বেসরকারি বিমা কোম্পানি ও কর্পোরেট হাসপাতালগুলিকে উপহার দেওয়ার প্রকল্প। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানিগুলির মোট ব্যবসা এখন ৩০,৩৯২ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই ব্যবসা বৃদ্ধির হার এখন ২৫ শতাংশ। বিমা কোম্পানিগুলির এই স্বাস্থ্যের উন্নতির পেছনে রয়েছে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও হাজার কিসিমের স্বাস্থ্য প্রকল্পের ভূমিকা।

প্রশ্ন হল, স্বাস্থ্যসাথীর মতো স্বাস্থ্য বিমা ছাড়া অন্য কোনও উপায় কি ছিল না স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রকৃত অর্থে আরও স্বাস্থ্যবান করে তোলার?

পশ্চিমবঙ্গেও কী ভিন্ন চেহারার খাপতন্ত্রের প্রভাব অলক্ষ্যে বাড়ছে?

নদিয়ার কৃষ্ণনগরের সাম্প্রতিক এক ঘটনায় তেমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেল। খবরে প্রকাশ, প্রাক্তন বিজেপি কর্মী এবং বর্তমানে সমাজসেবী বলে পরিচিত এক মহিলা প্রকাশ্য দিবালোকে প্রেমসম্পর্কে আবদ্ধ দুটি ভিন্ন ধর্মের ছেলেমেয়ের চুল কেটে, মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয়, এবং ছেলেটিকে শারীরিক নিগ্রহও করেছেন। কিন্তু জনাকীর্ণ বাসস্ট্যান্ডে, প্রণয়ী যুগলের পরিবারের লোকদের অনুরোধ উপেক্ষা যে দুরাচার সম্ভব হল তা, বিস্ময়ের এবং শঙ্কাজনক। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থানের 'খাপতন্ত্রে'র প্রতি আঙুল দেখিয়ে আত্মগরিমায় ভাসাতেই এযাবৎকাল অভ্যস্ত সংস্কৃতি বলেই এই ঘটনা সেই চির অভ্যস্তায়া বাধা পড়তে পারে। পশ্চিমবঙ্গবাসী অবগত, এই রাজ্যে জনপরিসর ও রাজনীতিতে, নাগরিকদের ধর্ম ও জাতপাতের পরিবর্তে রাজনৈতিক পরিচয়ই বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ নয়, সি পি এম, তৃণমূল, বিজেপি প্রভৃতি কোন রাজনৈতিক দলের অনুগামী, সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। রাজনৈতিক দলগুলির আধিপত্যবাদী প্রবণতা এই রাজ্যের সাধারণ নাগরিকদের সমাজজীবন ছাড়াও অনেকাংশে ব্যক্তিজীবনেরও নিয়ন্ত্রক। দলের নির্দেশে ব্যক্তিগত জমি ছেড়ে দিতে হবে, শিক্ষা, বিবাহ, চাকুরির ক্ষেত্রে দলের মতামত উপেক্ষা করা চলবে না, পার্টি বা লোকাল কমিটি ঘরের বা মেয়ে কার সঙ্গে মিশবে বা মিশবে না, ঠিক করে দেবে ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্য রাজ্যে সমাজবৃদ্ধরা গাছতলায় বসে যে কাজ করছেন, এই রাজ্যে রাজনৈতিক নেতাদের প্ররোচনায় 'সালিশি পুলিশ' সেই কাজটিই করছেন। অবশ্যই ধর্ম ও জাতপাতের মোড়কে নয়, অন্য মোড়কে। নাগরিকদের জীবনে জোর জবরদস্তি খাটাবার এই প্রবণতা দলমত নির্বিশেষে; বিশেষত রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা আঞ্চলিক বিশেষ ক্ষমতাবান রাজনৈতিকদলগুলির কাছে কোনও অভিনব ঘটনা নয়, বহুকাল ধরেই আচরিত নাগরিকদের রাজনৈতিক পরিচয়ভিত্তিক শোষণ ও দমননীতি পরিহার না করলে পশ্চিমবঙ্গেও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলির খাপতন্ত্রের মতই অন্য আঙ্গিকে অন্যায়ের প্রভাব জনজীবনকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে।

রাষ্ট্রদ্রোহিতা কারে কয়?

ক্রিকেট ম্যাচে পাকিস্তানের নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার 'অপরাধে' কাউকে অভিযুক্ত করাটা অবশ্যই আইন ও সংবিধান বিরোধী কাজ। সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচে ভারত পরাজিত হলেও, ভারতীয় দল এবং অধিনায়ক বিরাট কোহলি পাকিস্তান দল এবং অধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়ে খেলোয়াড়সুলভ মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন। গভীর অনুশোচনা ও লজ্জার বিষয়— খেলার মাঠের বাইরে রাজনৈতিক জগতের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রশংসনীয় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন ঘোষণা বা দাবি করছেন তিনি দেশের যুব সমাজের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন, শ্রীনগরের মেডিক্যাল কলেজের দুটি ছাত্রকে 'T20 ম্যাচে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে দানবীয় UAPA আইনে অভিযুক্ত করেছে জম্মু কাশ্মীরের পুলিশ। কংগ্রেসশাসিত রাজস্থানেও পুলিশ এক স্কুল শিক্ষককে সমাজ মাধ্যমে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সমর্থন করার অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে। উত্তরপ্রদেশের পুলিশ তিন কাশ্মীরি ছাত্রকে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সমর্থন করার অপরাধে শুধু গ্রেপ্তারই নয়, এদের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগ আনারও চিন্তা করছে।

সারা দেশেই বর্তমান রাজনৈতিক আবহে এই ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলগুলি যেন জাতীয়তাবাদের নামে এক অশুভ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঔপনিবেশিক আমলে সূচিত রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা Sedition Law-র প্রয়োগ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট আরও কঠোর অবস্থান নিতে কেন ব্যর্থ হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র আজ বিপন্ন বলেই, এর অন্যতম প্রধান স্তম্ভেও চিড় ধরেছে, যা অবশ্যই উদ্বেগজনক।

ভারতকে সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব ও অসমে আধা সামরিক বাহিনী বিএসএফের ক্ষমতা বাড়ানো হল। তিন রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে দেশের ভেতর পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত অঞ্চল তাদের এক্তিয়ারে চলে এলো। এই এলাকার মধ্যে বিএসএফ তল্লাশি, কারণ অকারণে বিভিন্ন দ্রব্য বাজেয়াপ্ত এবং কোনা ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। গত ১১ অক্টোবর কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নির্দেশ দিয়েছে। এতদিন তিনটি রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় বিএসএফের এই অধিকার ছিল। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গুজরাতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে বিএসএফের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা আশি কিলোমিটার থেকে কমে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়েছে। এছাড়া আগের মতো নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মণিপুরের রাজ্যের সঙ্গে লাদাখের পুরো অঞ্চল বিএসএফের এক্তিয়ারে থাকবে। প্রসঙ্গত মোদি সরকারই জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য তিন টুকরো করে লাদাখকে আলাদা করেছে। রাজস্থানে আগের মতোই সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকা বিএসএফের আওতাধীন থাকছে। সন্দেহ নেই পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পাঞ্জাবে বিএসএফের নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি বাড়ল।

পশ্চিমবঙ্গের দশটি জেলার দুই হাজার দু'শো কিলোমিটারের বেশি এলাকায় বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। নতুন নিয়মে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা বিএসএফের আওতাধীন হবে। রাজ্যের কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলার সিংহভাগই তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। নদীয়া জেলার বড় অংশ, উত্তর চব্বিশ পরগণার দুই-তৃতীয়াংশ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার এক-তৃতীয়াংশ বিএসএফের আওতাধীনে আসবে। শিলিগুড়ি, বহরমপুর, কৃষ্ণনগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরও আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি অনুপ্রবেশ, চোরাচালান রুখতে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নামে দেশের নাগরিকের নিরাপত্তা কেড়ে নেওয়ার অভিজ্ঞতা নতুন নয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা আসলে গণতন্ত্র ধ্বংস করার বড় অস্ত্র। কেন্দ্রের যুক্তি রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই বিএসএফ কাজ করে। তাই আধা সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র আধিপত্য বৃদ্ধির আশঙ্কা নেই। যুক্তিটা যে কতখানি মিথ্যা তা, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষ মাত্রেই জানেন। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিএসএফের অত্যাচারের অভিযোগ অতি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

চোরাচালান বা অনুপ্রবেশের অভিযোগে দেশের নাগরিকদের ওপর অত্যাচার, নারী নির্যাতন, গ্রেপ্তার করা এমনকি হত্যার ঘটনাত প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্যেও কাশ্মীরের মতো পেলেট গান ব্যবহার করে নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করার ঘটনা ঘটে। নির্যাতিতা নারী মানসিক অসুখে ভোগেন, ভয়ে সব কথা জানাতেও পারেন না। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সংখ্যালঘু, দলিত মানুষ বেশি অত্যাচারের শিকার হন। রাজ্য পুলিশকে সব ঘটনা কার্যত জানানোও হয় না। রাজ্য সরকারগুলি এসব বিষয়ে নীরব থাকতেই অভ্যস্ত। কেন্দ্র বা রাজ্যে যে সরকারই আসুক না কেন, দেশভাগের পর থেকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক মানুষ কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। প্রতিদিন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রমাণ করে তাঁদের বাঁচতে হয়। কোচবিহার জেলার ছিটমহলের পনেরো হাজার বাসিন্দার অবস্থা আরও করুণ। ভারত-বাংলাদেশ দুই সরকারেরই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হেনস্থার শিকার হন তাঁরা। সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার অঞ্চল আধা সামরিক বাহিনীর আওতায় চলে গেলে, একপ্রকারের সামরিক শাসন চালু হবে। উত্তর-পূর্ব ভারতসহ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এভাবেই আফস্পাসহ নানা আইনের বলে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

মোদি সরকারের আমলে সেই আশঙ্কা আরও বেশি। সাত বছরের অভিজ্ঞতা তাই বলে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত জুড়ে সামরিক আধিপত্য বাড়ানো হয়েছে। নতুন আদেশে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব অঞ্চলে সেই প্রভাব বাড়ানো হবে। আসামে দেশভাগের পর থেকে চলে আসা ভাষাগত পরিচয়সত্তার রাজনীতিকে, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে রূপান্তরিত করতে বিজেপি অনেকখানি সফল। এন আর সি ও নাগরিকত্ব আইন সংশোধনীকে অস্ত্র করে চলছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির অনুশীলন।

একদিকে এন আর সি'র জুজু দেখিয়ে, অপরদিকে সিএএ'র টোপ দিয়ে হিন্দু বাংলাভাষীদের একাংশের সমর্থন আদায়ে তারা সফল। বাংলাভাষী মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচার বাড়িয়ে, আবার বাংলাভাষীদের সঙ্গে অন্যান্য ভাষার লোকেদের বিরোধ বাধিয়ে বিজেপি এইসব অঞ্চলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল রাজ্য পুলিশের বদলে সামরিক আধিপত্য বৃদ্ধি। রাজ্যের ক্ষমতা কমিয়ে, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা যার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে এগোতে কেবল আন্তর্জাতিক সীমান্তই নয়, আন্তরাজ্য সীমান্তেও তারা অশান্তি পাকাতে চায়। এই বছরের জুলাই মাসে আসাম-মিজোরামের সীমান্তে দুই রাজ্য পুলিশের সংঘর্ষ বাধিয়ে সামরিক বাহিনীর আধিপত্য বাড়ানো হয়েছে। দুটি রাজ্যই বিজেপি শাসনাধীন। আসামে এনআরসি'র নামে বিশাল সংখ্যক নাগরিককে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করা হয়েছে। তাদের যখন ইচ্ছে কারারুদ্ধ করা যায়, বেনাগরিক করা যায়, হত্যা করা যায়। এই অবস্থায় আসামে সীমান্ত থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার এলাকা আধা সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে এলে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম হবে।

পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি ও সংঘ পরিবার সেই পরিবেশই চায়। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গেও পরিচয় সত্তার রাজনীতিকে অস্ত্র করে তারা অশান্তি সৃষ্টি করতে বহুদিন সচেষ্ট। নানা জনজাতি অধ্যুষিত বৈচিত্রময় উত্তরবঙ্গে এনআর সি-সিএএকে অস্ত্র করে পরিচয় সত্তার রাজনীতিতে তারা অনেকখানি সফল। ২০১৯ সালের লোকসভা ও সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলই তার প্রমাণ। উত্তরবঙ্গকে অলাদা রাজ্য করার দাবি তারই অঙ্গ। আধা সামরিক বাহিনীর আধিপত্য বাড়িয়ে সেই লক্ষ্যেই তারা এগোতে চায়।

শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহর নিয়ন্ত্রণে আনার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণবঙ্গেও এনআরসি- সিএএকে কেন্দ্র করে তারা মেরুকরণের রাজনীতিতে কিছুটা হলেও সফল হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের যৌথ সঙ্গতে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে অন্য ইস্যুগুলোকে অনেকখানি গৌণ করে দিয়েছিল। সন্দেহ নেই, বি এস এফের আওতাধীন এলাকা বাড়িয়ে সেই রাজনীতিকেই ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে। নতুন নিয়মে রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি কেন্দ্রের কোনো না কোনো অঞ্চল বিএসএফের আওতায় চলে আসছে। আধা সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, ধর্মীয় বিদ্বেষের বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করে রাজ্যের অর্ধেক লোকসভা কেন্দ্রে ভোটকে প্রভাবিত করার আশঙ্কা থাকছে। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে শীতলকুচিতে হত্যার ঘটনা এখনও রাজ্যবাসীর স্মৃতিতে রয়ে গেছে। সংঘ পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে আধা সামরিক বাহিনীকে দিয়েও ভোটে লাভের ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি।

আসাম ও পাঞ্জাবে আধা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি তারই অঙ্গ। পাঞ্জাবে ছ'টি জেলা পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী। সে রাজ্যে মাদক পাচার সামাজিক সমস্যার আকার ধারণ করেছে। রাজ্যের যুবসমাজের বড় অংশ মাদকাসক্ত। আশঙ্কা মাদক পাচার রোধের বদলে নতুন নীতিতে বিরোধী পক্ষের লোকেদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হবে। কৃষক আন্দোলনে সেরাজ্যে একেবারে কোণঠাসা বিজেপি এভাবেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে।

বিজেপি শাসিত গুজরাতে তাই বি এস এফের ক্ষমতা কমিয়ে বাংলা, পাঞ্জাবে বাড়ানো হয়। ভূ-রাজনীতিতে স্পর্শকাতর রাজ্যের কালিম্পং থেকে উত্তরের লাদাখে কায়েম হয় সামরিক আধিপত্য। যেখানে নিরাপত্তা আর নাগরিকের অধিকার কেড়ে নেওয়া সমার্থক। যেন গণতন্ত্রই নিরাপত্তার শত্রু। আসলে নিরাপত্তার নামে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল করে বাড়ানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের আধিপত্য। এন আই এ আইন সংশোধন করে এভাবেই রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। এন আই কে ব্যবহার করে সীমান্তবর্তী এলাকায় সংখ্যালঘুদের আক্রমণের লক্ষ্য করা হয়েছে। একইভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি বিরোধীদের গ্রেপ্তার, মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করার অস্ত্র হয়েছে। এন আই এ আইন সংশোধন আর বি এস এফের ক্ষমতাবৃদ্ধি তাই আলাদা কিছু নয়। যা ভোটের ফলাফলেও বড় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেবে।

বিগত সাত বছর মোদি সরকার রাজ্যগুলির প্রশাসনিক ক্ষমতা খর্ব করতে একের পর এক নীতি গ্রহণ করে চলেছে। জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে রাজ্যটিকে তিন টুকরো করে কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয়েছে। জঙ্গি দমন করা যায় নি। কিন্তু সামরিক শাসন কায়েম করা গেছে। তিনবার ভোটে হেরে গিয়ে দিল্লীর নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা খর্ব করতে কেন্দ্র নিযুক্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেলের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বারে বারে কেন্দ্রের নির্দেশে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নির্বাচিত রাজ্য সরকারের সমান্তরাল প্রশাসন চালাতে উদ্যোগী হয়েছে।

২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা কিছুটা বেড়েছিল। সম্প্রতি দ্য গভর্নমেন্ট অফ ন্যাশনাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অফ দিল্লী (সংশোধনী) বিল, ২০২১ প্রস্তুত করে রাজ্য সরকারকে কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়েছে। লেফটেন্যান্ট জেনারেলের অনুমোদন ছাড়া সরকার কোনো নীতি গ্রহণ করতে পারবে না।

দিল্লীর পুলিশ কেন্দ্রের অধীনে। সেই পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে ছাত্র-কৃষক- এনআর সি, সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে একের পর এক অগণতান্ত্রিক কাজ করে গেছে কেন্দ্র। গত বছর দিল্লীতে সাম্প্রদায়িকতাকে অস্ত্র করে গণহত্যার ঘটনাতেও দিল্লী পুলিশ ন্যক্করজনক ভূমিকা পালন করেছিল। যখন দিল্লী পুলিশকে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে দেওয়ার দাবি উঠছে, তখন মোদি সরকার উল্টে দিল্লীর নির্বাচিত সরকারেরই ক্ষমতা খর্ব করে দিল। অথচ, বিজেপি ও তাদের পূর্বসূরি জনসংঘ স্বাধীনতার পর থেকেই দিল্লীকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে সরব ছিল। মোদি যখন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন সেরাজ্যে বিএসএফের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকা কমানোর দাবি তুলেছিলেন। বিরোধী দল হিসেবে তারা তখন ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বিরোধিতা করেছে।

সেই বিরোধিতায় তাদের মনের কথা ছিল না। কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় ছিল না বলেই তারা রাজ্যের ক্ষমতার দাবি তুলেছিল। এখন কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর তাদের আসল রূপ প্রকাশ্যে আসছে। রাজ্যগুলির ক্ষমতা কমিয়ে, নির্বাচিত বিরোধী দলের সরকারগুলিকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত না করতে পারলে হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার এজেন্ডা বাস্তবায়িত হবে না। ফ্যাসিবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী বিজেপি তথা সংঘ পরিবার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো নয়, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণেই বিশ্বাসী। এভাবেই বিরোধীমুক্ত ভারতের নামে সামরিক শাসন বলবৎ করা তাদের লক্ষ্য। ভারতকে সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই তাই আধা সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা ও আওতাধীন এলাকা বৃদ্ধি করা হল। দেশের গণতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে রক্ষা করতে আন্দোলনের পথেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

খানাকুলে কর্মীসভা

গত ১২ সেপ্টেম্বর খানাকুলের গোবিন্দপুরে আর এস পি'র কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভার শুরুতে পতাকা উত্তোলন করেন দলের প্রবীণ নেতা কম. সুনীল চক্রবর্তী। কর্মীসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন আর এস পি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. রাজীব ব্যানার্জী, রাজ্য কমিটির সদস্য কম. দীপক সাহা। তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। কর্মীদের বক্তব্যে কৃষি সমস্যা, মৎস্যজীবী, তাঁত শ্রমিকদের সমস্যার কথা উঠে আসে। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, জেলা কমিটির সদস্য কম. বিপ্লব মজুমদার, কম. ভাস্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। সভায় প্রায় আশি জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঐতিহাসিক নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় বর্তমান পরিস্থিতি

১-এর পাতার পর

চালিকা শক্তি, প্রস্তুতিপর্বে লেনিন প্রমুখর নেতৃত্বে বলশেভিক দল সেই সচেতন শক্তির সক্রিয়তা তীব্র করার কর্মসূচিই গ্রহণ করে চলেছিল।

মার্কসীয় দর্শন ও অর্থনীতির ফলিত প্রয়োগের সচেতন ও সাবধানী সাংগঠনিক প্রচেষ্টাই ছিল বলেশেভিক নেতৃত্বে নভেম্বর বিপ্লবের সঠিক মুহূর্ত সন্ধানের চাবিকাঠি। ১৮৪৮ সালে মার্কস ইউরোপে পুঁজিবাদের সংকটকে বিপ্লবের মাতৃজঠর ও সংকট পরবর্তী স্বচ্ছলতাকে প্রতিক্রিয়ার মাতৃজঠর বলে চিহ্নিত করেছিলেন। পরিণত মার্কস-এঙ্গেলস শুধুমাত্র সংকটের মধ্যেই বিপ্লবের সম্ভাবনার ধারণাকে পরবর্তীকালে পরিবর্তন করেছিলেন। সংকট থেকে উদ্ধার পেতে পুঁজিবাদ যে কখনও রাষ্ট্রনির্ভর নিয়ন্ত্রণ, কখনও বা মুক্ত প্রতিযোগিতা এবং প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ, সমরনির্ভর অর্থনীতির পথ অনুসরণ করে সেই বিষয়ও ক্যাপিটালে বিশ্লেষণ করেছেন।

পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী বিস্তার, আন্তর্জাতিক সংকট তথা ফিনান্স পুঁজির আধিপত্য সম্পর্কিত বিশ্লেষণে লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের শেষ বা উচ্চতম স্তর সম্পর্কিত গবেষণার মধ্যে দিয়ে জাতিরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সর্বহারা শ্রেণি ও বিপ্লবী দলের রাজনৈতিক দর্শন তুলে ধরেন।

নভেম্বর বিপ্লবের প্রস্তুতিকালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি বৈপ্লবিক মুহূর্ত নির্ধারণের জন্য পুঁজিবাদী সংকট ও শোষিত শ্রেণির চূড়ান্ত শোষণকে একমাত্র উপাদান বলে মনে করতেন না। শ্রমকারী শ্রেণির আত্মমুক্তির শর্তকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। বৈপ্লবিক বাস্তবতা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি, সবার উপরে শ্রমজীবী শ্রেণির প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন চরম সংকটের দিনে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ঐতিহ্যবাহী শ্রমিক সংগঠন ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক দলগুলির তথাকথিত দেশভক্তি এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন লেনিনের নেতৃত্বে প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবাদী নেতৃত্ব ও বলশেভিক দলের বিপ্লব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী আরও স্বচ্ছ করেছিল।

শুধুমাত্র সংকট থাকলেই বিপ্লব হয় না, একথা যেমন সত্য, সুতীব্র ইচ্ছা বা ভলান্টারিজমও বিপ্লবের পথ মসৃণ করতে পারে না। বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে এই বিষয়টির ফলিত অভিমুখটি তুলে ধরেন। যান্ত্রিক নির্ধারণবাদমুখী চিন্তা অথবা ভলান্টারিজিম প্রসূত বিপ্লবী কর্মসূচি; সোভিয়েত ইউনিয়নে নভেম্বর বিপ্লবের পর একে একে ইউরোপের গণবিপ্লব সমূহের ব্যর্থতার পরও লেনিন-ট্রটস্কি নেতৃত্বের কাছে অবৈজ্ঞানিক এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদবিরোধী কৌশল বলে পরিগণিত হয়েছিল। কমিনটার্নের তৃতীয় কংগ্রেসে ১৯২১ সালে ট্রটস্কির ঘোষণায় লেনিনেরই বিশ্লেষণের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। "এমন কোন সংকট নেই যখন, পুঁজিবাদ নিজে থেকেই মৃত্যুবরণ করে। অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রেণির কাছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।"

নভেম্বর বিপ্লবের প্রাসঙ্গিকতা ও সার্থকতার বীজ উপ্ত রয়েছে আর্থসামাজিক বাস্তবতা এবং বিপ্লববিদিতার গভীরে। নভেম্বর বিপ্লবের দুবছর আগেই তাঁর প্রত্যাশা মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট দলগুলির চরম বিচ্যুতি ও বৈপ্লবিক সম্ভাবনার অন্তর্জলি যাত্রা দেখে বিপ্লবের সার্থকতা ও ব্যর্থতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বিশ্লেষণ করেছেন লেনিন। 'কোলাপ্স অফ দি সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল' প্রবন্ধে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন যে, যখন কোনও পরিবর্তন ছাড়া শোষক শ্রেণির পক্ষে শাসন পরিচালনা করা অসম্ভব, যে কোন সংকটের অভিঘাতে শাসকশ্রেণি স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে শোষিতের সীমাহীন জর্জরতা থেকে বিক্ষোভ বিস্ফোরণের রূপ নিচ্ছে, তখন শুধু শোষিত শ্রেণি সমূহই নয়, শোষক শ্রেণিও পুরানো কায়দায় টিকে থাকতে পারছে না তখনই, বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এবং, শান্তির আবহ চূর্ণ হয়ে শোষিতের বঞ্চনা চূড়ান্ত হলে খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী সক্রিয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। শান্তিকালের তুলনায় উচ্চবর্গস্থিত শ্রেণিগুলির শোষণের মুখোমুখি হওয়ার জন্য ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয় শ্রমকারী শ্রেণি।

সেই বাস্তব বৈপ্লবিক মুহূর্তে প্রয়োজন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সম্পর্ক অবলুপ্তির জন্য সংগঠিত বিপ্লবী দলের অনুঘটকসম ভূমিকা।

সমাজক্রান্তিতে শ্রমজীবী শ্রেণির স্বমুক্তির প্রশ্নে বিপ্লবী দলের ভূমিকা এবং শোষণের অবসান ঘটাতে সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের দীর্ঘ পথে শ্রমিক শ্রেণির একাধিপত্যে অংশগ্রহণ করে শ্রেণি বিলুপ্তির কর্মসূচি নভেম্বর বিপ্লবে সূত্রপাত হয়েছিল। পুঁজিবাদী সংকট, বিপ্লবী মুহূর্ত নির্ধারণ ও বিপ্লবী দলের ভূমিকা সম্বন্ধে অবশ্যই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের দিগ্‌দর্শন ও ফলিত অনুশীলন মার্কসবাদে প্রত্যয়ী কর্মীর কাছে সর্বদাই প্রাসঙ্গিক। কোনো আপ্তবাক্য বা বাঁধাধরা কোনো ফর্মূলা অনুসরণের নির্দেশ তাঁরা দেন নি, দেওয়াও অবৈজ্ঞানিক। আবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণির স্বমুক্তির বিষয় বলে, শৃঙ্খলাবদ্ধ বিপ্লবী দলের গুরুত্বও তাঁরা অস্বীকার করেন নি। আর আপাতদৃষ্টিতে নভেম্বরের নির্দিষ্ট, দিনটিতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতাদখলের বিষয়টি যতই সামরিক ষড়যন্ত্রমূলক বলে প্রচারিত হোক না কেন, এর পশ্চাৎপটে ছিল দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পেরোনো প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সচেতন শ্রমিক শ্রেণির সংগঠিত সচেতন দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা। বৈপ্লবিক বাস্তবতা শ্রমিকশ্রেণির চেতনাকে পাথেয় করে বিপ্লবী দলের বিষয়ী হয়ে ওঠাই ছিল মুখ্য বিষয়।

বর্তমান যুগের বিশ্বব্যাপী নয়াউদারবাদী আগ্রাসন ও প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আবহে শ্রমজীবী শ্রেণি সহ প্রতিটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে অবিরত। বিশেষ করে গত দু'বছর ধরে করোনা অতিমারিতে সারা পৃথিবীর অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ৬ শতাংশেরও বেশি। ১৮৭০ সালের পর ২০২০ সালে মাথাপিছু উৎপাদন কমেছে। আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ যেন এক প্রহসন। জোগান, চাহিদা, বাণিজ্য লগ্নীপুঁজি, সর্বক্ষেত্রেই সংকোচন লক্ষ করা গেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সংকটের বোঝা চাপছে সমাজের মধ্যবিত্ত গরিব সহ সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের ওপর।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মন্দা চলছে অতিমারীর আগে থেকেই। বিশেষ করে নোটবাতিল এবং জি এস টি'র ধাক্কায় অসংগঠিত ক্ষেত্র ধুঁকছিল গত পাঁচ বছর ধরে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি হয়ে চেপেছে অতিমারি জনিত শারীরিক সংক্রমণ এড়ানোর অপরিকল্পিত রাষ্ট্রিক অনুশাসনে কর্মহীনতা। আন্তর্জাতিক মানের আয়ের মাপকাঠিতে Pew Research Centre দরিদ্র নিম্নআয়সম্পন্ন, মধ্য আয়সম্পন্ন উচ্চ মধ্যবিত্ত আয়সম্পন্ন এবং উচ্চ আয়সম্পন্ন স্তর বিভাগ করে সমীক্ষা করেছে। সমীক্ষার ফলাফলে ভয়াবহ করুণচিত্র সামনে এসেছে। ভারতে এই সময়ে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ৯ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে কমে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ হয়েছে। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর হ্রাসপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তের সংখ্যার ৬০ শতাংশই ভারতে। গরিব মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ভারতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ; এখানেও গরিব মানুষ বৃদ্ধির অনুপাত পৃথিবীর ৬০ শতাংশ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমকারী মানুষ জাতীয় আয়ের ২০১৭-১৮ সালেও (মোট শ্রমশক্তির ৮৭ শতাংশ) ৫২.৪ শতাংশ মূল্য যোগ করত। ২০২০-২১ এ অতিমারিতে যোগ করেছে জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫-২০ শতাংশ। অন্যদিকে গৌতম আদানির সম্পদ এক বছরে বেড়েছে ১৩০০ কোটি ডলার থেকে ৫৫০০ কোটি ডলার; মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়ে হয়েছে ৮০০০ কোটি ডলার। সারা দেশের মোট মুনাফার ৯০ শতাংশ জমা পড়েছে মাত্র ১৫টি কর্পোরেট গোষ্ঠীর কোষাগারে। সর্বাধিক সম্পদশালী ৯ শতাংশের শেয়ারের মূল্য বেড়েছে ৪০.৫ গুণ।

এদিকে কোভিড ভাইরাসে মারা গেছেন ৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ। আমাদের দেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশ, প্রায় ১০ কোটিরও বেশি দেশের মধ্যেই ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে আচমকা লকডাউন ঘোষণায় কর্মহীন হয়ে নিজেদের গ্রাম শহরে ফিরতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েক শত পথেই পথ দুর্ঘটনা ব্যাধি ও ক্ষুধায় মারা গেছেন।

এই নিদারুণ সংকটের মধ্যেই বিজেপি সরকার তিনটি কৃষি আইন, নয়া শিক্ষানীতি, পরিবেশ ও জঙ্গলের অধিকার খর্ব করে প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের নীতি, ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা, বিমান পরিষেবা, বি এস এন এল, ও এন জি সি প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় সংস্থার বেসরকারিকরণ। চারটি শ্রম কোড চালু সহ অনেকগুলি আইন ও প্রশাসনিক আদেশ বহাল করেছে। গত পাঁচ দশকের মধ্যে বেকারত্ব বেড়েছে সর্বাধিক।

নভেম্বর বিপ্লব প্রসঙ্গে লেনিনের সমাজ রূপান্তরের লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ভারতে আর্থ সামাজিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। শাসক শ্রেণি একে একে উদারগণতন্ত্রের স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেলে দিলেও সংসদীয় গণতন্ত্রকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে পারেনি। পুরানো কায়দার শাসন শোষণ বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু হলেও, এখনও শাসক ও শোষিত কোনো পক্ষই প্রস্তুত নয়, পুরানো ব্যবস্থাটা আমূল বদলে দিতে। দেশের শ্রমজীবী শ্রেণির কাছে এখনও গণঅভ্যুত্থানে বা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় অনুঘটকের ভূমিকায় কোনো বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে চলার মতো পরিণত অবস্থার শর্ত তৈরি হয় নি।

নভেম্বর বিপ্লব আমাদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে বার্তা পাঠাচ্ছে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মিত না হলে মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য। চরম আর্থসামাজিক সংকটে প্রতিক্রিয়ার হাত শক্তিশালী হলেও দেশে দেশে বিপ্লবী শক্তিকে অধৈর্য হয়ে, হঠকারি পথ গ্রহণ করা উচিত নয়। ধৈর্য ধরে সমস্ত শোষিত শ্রেণির সঙ্গে অবশ্যই শ্রমজীবী শ্রেণির স্বমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয়তা সচেতন সক্রিয়তা নির্মাণের জন্য শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। প্রতিটি মুহূর্তে সমাজের বাস্তব অবস্থায় আর্থসামাজিক দ্বন্দ্বগুলির প্রেক্ষিতে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী অনুশীলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ড

দক্ষিণ ভারতের, বিশেষ করে কর্নাটক রাজ্যের সুখ্যাত যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মী, সাহসী সাংবাদিক এবং সম্পাদক গৌরী লঙ্কেশকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭। বেঙ্গালুরু শহরে তাঁর বাসস্থানেই এই সমাজকর্মী ও সাংবাদিককে খুব কাছ থেকে পরপর গুলি চালিয়ে হত্যা করে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সঙ্গে যুক্ত সমাজ বিরোধীরা।

এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সভা সমাবেশ সংগঠিত হয়েছিল দেশের নানা স্থানে। এই চরম অপরাধ সংঘটিত হবার আগে কর্নাটকেই প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং হাম্পি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এম এম কালবুর্গিকে প্রায় একইভাবে হত্যা করা হয়েছিল। নির্দিষ্টভাবে অপরাধীদের সনাক্ত করতে রাজ্য পুলিশ বাহিনী ব্যর্থ হয়।

গৌরী লঙ্কেশ হত্যাকাণ্ডের পর সারা দেশের প্রতিবাদী আন্দোলনের জন্যই সম্ভবত পুলিশী তদন্ত বেগবান হয়। কিছু সংখ্যক হত্যাকারীকে ভুল বা ঠিকভাবে চিহ্নিত করে তদন্ত শুরু হয়। এত দীর্ঘকাল পরে গত ২১ অক্টোবর কর্নাটক পুলিশ প্রথম চার্জশিট আদালতে জমা দিল। ভারতেই ভয় হয় যে, এত হাই প্রোফাইল কেসের তদন্ত যদি এমন অস্বাভাবিক ধীর গতিতে এগোয় তাহলে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কি হতে পারে এবং কি হচ্ছে।

সমগ্র দেশেই বিগত প্রায় ৫-৬ বছর ধরে নানাভাবে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি বিশেষ বিপর্যস্ত। পরিকল্পিত ভাবেই মানুষে মানুষে বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাত্মক বিভেদ নির্মিত হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যেই নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এই সময়কালে যদি বিচারব্যবস্থা আরও সুঠাম না হয় তাহলে দেশের মানুষের জীবন যন্ত্রণা বহুগুণ বেড়েই চলবে।

নয়াউদারবাদে উন্নয়ন একটি পণ্য

মনোজ ভট্টাচার্য

সেসেই সময়কালটি স্বাধীনোত্তর ভারতের আর্থ-রাজনীতি স্তরে বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে বিদীর্ণ। অনতিদূর অতীতের দু'টি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, বিশেষ করে রপ্তানি নীতি এমনভাবে অনুসৃত হয়েছিল যে, দেশের কেন্দ্রীয় কোষাগারে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা ভাণ্ডার নিঃশেষিত প্রায়। ১৯৭৬ থেকেই এই ধারা ধীরে ধীরে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। ১৯৮৪ থেকে এই প্রবাহ এতটাই অপরিণামদর্শিতায় ভারাক্রান্ত যে, ১৯৯০ সালে ভারতের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত করে দুই দফার ৬৭ টন সোনা বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে কাজ চালানোর মতো বৈদেশিক মুদ্রা ঋণের ব্যবস্থা করতে হয়। এসব বিষয় সকলেই কমবেশি জানেন। তবে এসব নিয়ে ইদানিংকালে জনমধ্যে তেমন কোনও প্রতর্ক প্রায় হয় না বললেই চলে। বিস্মৃত হলে চলবে না যে, উল্লিখিত অর্থনৈতিক নৈরাজ্য অবসানের লক্ষ্যেই ১৯৯১ সালের ১ জুলাই থেকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের কর্মসূচি জোর কদমে চলতে শুরু করে। শুরু হয়ে যায় নয়া উদারবাদ আশ্রিত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন। বিশ্বায়ন প্রণীত অর্থনৈতিক সূত্রগুলি বেগবান হতে শুরু করে এদেশে। সন্দেহ নেই, প্রয়াত নরসিমহা রাও সরকার নিঃশর্তে বিশ্বপুঁজির মুরুব্বি দেশগুলির কাজে আত্মসমর্পণ করেছিল। বাধ্যবাধকতার উল্লেখ করেই সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

এ উচ্চারণ বাহুল্যমাত্র যে, নয়াউদারবাদ কোনো দর্শন নয়। এটি সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া আন্তর্জাতিক পুঁজি ব্যবস্থার বাঁচার নতুনতম পথ সন্ধান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই সন্ধান সীমিত অর্থে নয়, ব্যাপক অর্থে বড়ো দীর্ঘস্থায়ী অভিঘাত সৃষ্টি করে। সম্ভবত সে কারণেই এই ব্যবস্থাটিকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রস্তাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি। এক সার্বিক বহুমুখী ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বের নানা দেশের জনসমাজে চারিয়ে দেবার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই সব পরিকল্পনার উদ্‌গাতা অবশ্যই পুঁজি ও শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি। বিশেষ করে শিকাগোর স্কুল অফ ইকোনমিকসের মিল্টন ফ্রাইডম্যান ও অন্যান্যদের উদ্ভাবিত মডেল। তাঁদেরও আগে অস্ট্রিয়ান-ব্রিটিশ অর্থনীতিশাস্ত্রী ফ্রিডরিখ অগস্ট ভন হায়েক যিনি ধ্রুপদী উদারবাদের পক্ষে জোর সওয়াল করেছিলেন, তাঁর নামও উল্লেখ্য। বিশ্বের উত্তর গোলার্ধে এদের অবস্থিতি। তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বর্তমান দুনিয়ার সর্ববৃহৎ দু'টি ঋণদানকারী সংস্থা যথা, আই এম এফ ও বিশ্বব্যাঙ্ক। এই দুটি অতি শক্তিমত্ত সংস্থার সঙ্গে যুক্ত নামী অর্থনীতিশাস্ত্রী এবং সমাজবিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিতরা প্রতিনিয়ত গবেষণা করে নতুন নতুন আর্থ-সামাজিক প্রকল্প নির্মাণ করেন একান্তভাবেই পুঁজিব্যবস্থার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে। বিশ্বের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার কোনো দায় এদের নেই।

ওরা বললেন বিশ্বায়িত পুঁজি ব্যবস্থায় সমস্ত রাষ্ট্রের বাজার উন্মুক্ত থাকবে। কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই একটি দেশের উৎপাদিত পণ্য অন্য দেশে প্রবেশ করবে। কোনো শুল্ক-প্রাচীর তোলা যাবে না। এভাবেই উৎপাদনের আন্তর্জাতিকীকরণ হবে। একইভাবে একদেশের পুঁজি বা লগ্নি বিনা বাধায় অন্য যে কোনো রাষ্ট্রে অনায়াসে চলে যাবে। তথ্যপ্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়নে সামান্য 'মাউস' বা ইঁদুরে চাপ দিয়েই এক দেশের বিনিয়োগ অন্যদেশে চলে যাবে। কোনো রাষ্ট্রই কোনো বাধার প্রাচীর তুলবে না। এভাবেই পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ হবে। একদেশের পুঁজি অন্যদেশে প্রবেশ করার আগে সেই দেশের আইন ও বিধি পুঁজির অনুকূলে পরিবর্তিত হবে। কোনো দেশের নিজস্ব সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবিধান ও আইনের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন আবশ্যিক। একইসঙ্গে বিবিধ জাতিগত বৈচিত্রপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি অপনীত হয়ে একই সংস্কৃতি সারা বিশ্বজুড়ে চলবে। এই চালনার নৈতিক অনুমোদন দেবে আন্তর্জাতিক বিপুলায়তন ঋণদাতা সংস্থা দুটি। অর্থাৎ বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ।

ব্যাপক অর্থে সংস্কৃতি মানে নিশ্চিতই শুধু সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য বা নানাবিধ ললিতকলার সুমধুর উপস্থাপনাই নয়। এককথায় জীবনচর্যার মধ্যেই সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। নিঃসন্দেহে নানা দেশকাল পরিবেশ প্রভৃতি সমন্বিত অধ্যাসকেই কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এর রূপ ভেদই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বায়নপ্রসূত ফরমানে সবকিছুই একই ছাঁচে আবদ্ধ করা হবে। সহজ অর্থে, এর ফলে বিভিন্ন জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। আদিমকাল থেকে প্রবহমান বহু সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা বিলুপ্ত হয়ে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যও হারিয়ে যাবে। সমাহিত রুচির বিচারে যা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী তা পরিত্যাজ্য। বর্ণে, শব্দে ও শারীরিক ছন্দে যা উচ্চকিত তাকেই সংস্কৃতি বলে গ্রাহ্য করা হবে। সুর তাল লয়ে যা কিছু কর্ণপটাহ বিদীর্ণ করতে পারে তাকেই সঙ্গীত ও নৃত্য বলে গ্রাহ্য করা হবে। ফলে জাতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অবলুপ্ত হয়ে একই ধরনের শহর ও বসতি গড়ে উঠবে। ক্রমে হারিয়ে যাবে জাতিরাষ্ট্রের পরিচিতি পর্যন্ত। সুউচ্চ অট্টালিকার সারি সব শহরেই একই স্থাপত্যসঞ্জাত। যাহা আমেরিকায় বা ইংলন্ডে, তাহাই ভিয়েতনাম বা ভারতেও। নির্দিষ্ট দেশের প্রকৃতি পরিবেশে বা বাস্তুতন্ত্রের কী হচ্ছে তা বোধের মধ্যে না থাকলেও চলবে।

বিগত শতকের নব্বই-এর দশকে এসব বিবরণকে প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকদের কিছুটা বাড়াবাড়ি ও অহেতুক দুশ্চিন্তা বলে অনেকে মনে করতেন। আধুনিক জীবনচর্যার আকুতির কাছে এই পরিবর্তনকে 'উন্নয়ন' মোড়কে পরিবেশন করা হতে শুরু করে। পশ্চাদপদ বিশ্বের নানা দেশেও সাধারণ মানুষের কাছে সুপরিকল্পিত পন্থায় বেশ সোচ্চারে উন্নয়নের যাথার্থ্য নির্মাণ চলতে শুরু করে। বর্তমান সময়ে সম্ভবত অনেক উদাহরণ সহকারে বিবৃত করা অহেতুক যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে সযত্ন প্রয়াসে উদ্ভাবিত জীবন চর্যাকেই অত্যাধুনিক এবং হৃদয়গ্রাহী বলে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রায় পূর্ণতা প্রাপ্ত। এর সঙ্গে অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির অভাবিত পূর্ব উন্নতির এক বিশেষ তাৎপর্যময় ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ বসবাসের উপযুক্ত হতে হলে আঞ্চলিক, পরিবেশগত কিংবা ঐতিহ্য অনুসারী জীবনচর্যা জলাঞ্জলি দিয়ে একই ধরনের খাদ্যাভ্যাস, ভাল মন্দের বিবেচনা বা বিচার শূন্য মনন, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাক্রম ইত্যাদি সবই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির অন্ধ অনুকরণ আধুনিকতা বলে বিবেচিত হয়ে চলেছে। চমকদার রঙিন বিজ্ঞাপনে মজে অনেক ক্ষমতাহীন মানুষ আকণ্ঠ ঋণের ফাঁদে আবদ্ধ হয়েও আধুনিক হবার ইঁদুর দৌড়ে সামিল হয়ে চলেছেন। অপরিণামদর্শী নগরায়ণ এক অবরুদ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে স্বীকৃতিলাভ করছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের নির্বিচার বিলয় সম্ভব করতে অনেকেই উন্মাদপ্রায়।

মুক্ত বাজার আর্থনীতিক ব্যবস্থায় মানুষের পরিচয় ও সার্থকতা নিরূপিত হয় সেই মানুষ ক্রেতা হিসেবে কতটা সক্ষম, তার ওপরেই। পারিপার্শ্বিক যোগ্যতা অর্জনের সুঠাম ব্যবস্থা ব্যাতিরেকেই সকলে উচ্চকিত বিজ্ঞাপনের মোহে চঞ্চল হয়ে উঠছেন বা বিপুলবেগে তাঁদের মননকে অনুরণিত করা হচ্ছে একই দিকনির্দেশে ধাবিত করার উদ্দেশে। সামাজিক ভারসাম্যগত বিকৃতির প্রকাশ প্রতিনিয়ত। সততা ও জীবন-আদর্শবোধকে অযাচিত বোধ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। যে করেই হোক, বাজারে প্রবেশ করে সর্বসুখ আহরণ এক স্বাভাবিক গরজে পরিণত। সামাজিক সহযোগিতার বোধ পরিত্যক্ত। শুধুই প্রতিযোগিতা। বহু পরিবারের মধ্যেও এমন বোধ চারিয়ে গেছে। যো জিতা ওহী সিকান্দর। দুর্নীতি বলে যা অদূর অতীতেও অনৈতিক বলে বিবেচিত হতো তা এখন অকৃতকার্যের বৃথা ক্রন্দন বলে উপহাসের প্রসঙ্গ। ঝাঁ চকচকে ফ্লাইওভার, দ্রুতগামী প্রশস্ত পথ, সাইকাডেলিক অলোর রোশনাই প্রভৃতির নির্বাধ আয়োজনে নগর জীবনের চরম সার্থকতা। আর বিকট শব্দ ও বিকৃত ছন্দের সঙ্গে রাত্রিভোর শরীর সঞ্চালন নৃত্যশৈলীর প্রকাশ বলে বিবেচিত হচ্ছে। হারিয়ে গেছে শ্রেয়সের সাধনা ও সন্ধান।

কৃত্রিমভাবে সংগঠিত প্রলোভনের অপার বিস্তারে অনেক আপাত সচেতন ব্যক্তিও তাঁর সামাজিক অস্তিত্ব এবং বোধ অবহেলা করে অনির্দেশ্য পথে ধাবমান। বিশ্বের তাবৎ পার্থিব সম্পদ অপ্রয়োজনেও নিজের বসত-আঙিনায় জড়ো করতে উন্মত্ত। পণ্যভোগী অতিক্রুর এক বিকৃত সংস্কৃতি মান্যতাপ্রাপ্ত সমাজজীবনের নানা স্তরে। অন্যের আয়ত্তে যা কিছু দৃশ্যমান তা সবই একান্ত লোভনীয়। তা সংগ্রহ করার মধ্যেই জীবনের সর্বসুখ ও সার্থকতা। দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে একাংশ মানুষ আলোর রোশনাই-এ পতঙ্গবৎ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। জীবনের যথার্থ সন্ধান ও উদ্‌যাপন মুর্খের বোধ বলে ধারাবাহিকভাবে পরিত্যক্ত। সুস্থ সমাজ চেতনা আপাতত বিস্মরণের প্রায়ান্ধকারে পর্যুদস্ত। প্রশ্নহীন প্রতিবাদহীন এক অনড় জরাগ্রস্ত জীবন বহু মানুষকে ক্লান্ত করলেও বাস্তবে অন্য কিছুর সন্ধানকেই বৃথা বলে বোধ করছেন। মেনে নাও মানিয়ে নাও। মরীচিকা জেনেও তা স্পর্শ করার, অধিকার করার অদম্য আকুতিতে অগম্য পথে ধাবমান হওয়াই কাঙ্ক্ষিত বলে ব্যক্তিসত্তার কাছে গ্রাহ্য। সামাজিক অনন্বয় স্বাভাবিক। সবাই একক। ভোগবাদের অলীক হাতছানিতে ন্যুব্জ কিন্তু নিজেকে সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসবিহীন। যাঁরা এমন অসম এবং বিকারগ্রস্ত প্রতিযোগিতামূলক আচরণের বৃত্তচ্যুত তাদের ঘৃণা করতে নিয়ত পাঠ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত সমাজ সংস্কৃতির অভ্যন্তরেই এমন বিষবৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। বহুক্ষেত্রে ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠেছে সেই বিষবৃক্ষ। কখনও সমাজমানসের অনবধানে কখনও বা সচেতন উদ্যোগে। যাঁরা সচেতন উদ্যোগ নিচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই এমন অসম ব্যবস্থার বিকৃতিসম্পন্ন সুখ আস্বাদন করে নিজেদের ঐহিক জীবনকে এক নিরালম্ব সত্তাবিশিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোন পথে করেছেন তা আর বিবেচ্য নয়। যে কোনো ভাবেই হোক্, নিষিদ্ধ হলেও সেই ফলের নিবিড় আস্বাদন বড়োই তৃপ্তিপ্রদ।

সমাজবোধ রহিত মানবসত্তা সাধারণ নিয়মেই নানাবিধ বিকৃতির অসহায় শিকার। এমন প্রক্রিয়ায় সামিল হবার প্রথমদিকে অনুভূত বিবেকদংশন হয়তো অনেককে বিপন্ন করে। আবার সেই বিপন্নতা মুক্ত হবার সচেতন পথে চলার মতো মানসিক দৃঢ়তার অভাবে তা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। প্রাথমিক যন্ত্রণাবোধ বেশিকাল বিষণ্ণ করে চলে না, গা সওয়া হয়ে পড়ে। এমন এক অসহায় নিরালম্ব মানবসত্তা বিপুল সংখ্যায় নির্মিত হলেই স্থিতাবস্থার স্বস্তি। তাদের অর্থাৎ, স্থিতাবস্থার অস্তিত্ব সংকট মুক্ত করে ও বিরুদ্ধবাদীদের পরাভব সূচিত করে। আর যাঁরা কোনভাবেই আপস করতে বা প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন স্থিতাবস্থার কাছে নতিস্বীকারে অস্বীকৃত, তাঁদের জন্য মুক্তবাজারের চৌকিদারস্বরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা সদা সতর্ক, রক্তচক্ষুর প্রদর্শনে সেইসব বেয়াড়া মানুষদের স্তব্ধ করতে নানাবিধ নিগ্রহমূলক বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত। তেমন হলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে যুক্ত বলে অভিযোগ উত্থাপন করে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারের অন্ধকুঠুরির রোষবহ্নি তো আছেই। সামান্যতম প্রতিরোধ বা প্রতিবাদের প্রচেষ্টাও অবদমিত হবে নিষ্ঠুর আঘাতে। আন্ডা সেল-এর কথা তো এদেশের অনেকেই জানেন। যেমন অনেকেই জানেন, স্ট্যান স্বামীর মতো এক দৃঢ় সমাজকর্মীকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হতে হয়। কারণ, তিনি বশ্যতা স্বীকারের পাঠ নেন নি। এমন এক বিপরীত সময়েও তিনি প্রতিকার চেয়েছেন বহুজনের জীবন বিপন্নতার।

কেমন যেন চক্ষুলজ্জা বিবর্জিত এক ব্যবস্থা বিশ্বজনের নৈতিকতাকে অবদমিত করে ফেলছে। দেশের অর্থনৈতিক সমস্ত কর্মকান্ড থেকে রাষ্ট্র প্রত্যাহৃত। সবই হবে রাষ্ট্রের ন্যূনতম কর্তৃত্ব বর্জিত হয়ে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র বেওসাদাবদারের লোভের ও লাভের কড়িতে টান পড়লে তা থেকে উদ্ধার করার যন্ত্র বিশেষ। যদি কেউ অন্য কোন পথে ধাবিত হন যা, কতিপয় ব্যক্তির বিত্ত বাসনাকে সামান্য প্রতিহত করে বহুজনের বাঁচার পথ সন্ধান করে তবে, তার শিরচ্ছেদ বর্তমান ধারার রাষ্ট্রের পবিত্র ধর্ম বলেই বিবেচিত হয়ে চলেছে। শুধুমাত্র অতি বিত্তবানদের ইচ্ছাই চরম সত্য, তাহার উপরে নাই। এ পথই এখন রাষ্ট্রের কল্যাণকামনা বর্জিত এক শবসাধনায় পর্যবসিত। গভীর বিলাপে যন্ত্রণাদগ্ধ হতে হয় যে, সাধারণ জনসমাজ এক অশুভ ভবিতব্যের দিকে নিবিড়ভাবে তা মানবিক অস্তিত্ব বিপন্ন করে ধাবিত। মনুষ্যত্ববোধ এবং সমাজ প্রগতির প্রতিষ্ঠা নিকষকালো অন্ধকারের গর্ভে বিলীয়মান। এমন ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী প্রজন্মের কাছে মানুষ হিসেবে উন্নত পরিচয়ও অবনমিত হয়ে পড়ার আতঙ্ক থেকে মুক্ত থাকার পথও অবরুদ্ধ হবে। (২৭ অক্টোবর, ২০২১)

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে

আর এস পি'র কর্মীসভা

গত ২৪ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জে দলের জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত কম. নর্মদা রায় মঞ্চে বিজয়া সম্মেলনীর নাম করে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জননেতা কম. ক্ষিতি গোস্বামী, রাজ্য কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন বিধায়ক কম. নর্মদা রায়, ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদক কম. তাপস দাসচৌধুরী, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদিকা কম. শম্পা সেনগুপ্ত, জঙ্গিপুর বিধানসভায় আর এস পি প্রার্থী কম. প্রদীপ নন্দী, মার্কসবাদী চিন্তক ও তত্ত্ববিদ কম. অরবিন্দ পোদ্দার, বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষ সহ সমগ্র বিশ্বে করোনা অতিমারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কম. দেবব্রত কর।

সভায় আর এস পি'র সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য, রাজ্য সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী, রাজ্য কমিটির সদস্য কম. মৃন্ময় চট্টোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক কম. আনন্দবিহারী বসাক, জেলা নেতৃত্ব ছাড়াও কালিয়াগঞ্জের বহু সংখ্যক উৎসাহী কর্মীদের উপস্থিতি সভাকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

জেলা কমিটির সম্পাদক কম. আনন্দ বিহারী বসাক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। পি এস ইউ কালিয়াগঞ্জ থানা কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত নেতাদের হাতে বিজয়ার প্রণামসূচক স্মারক তুলে দেওয়া হয়। আর এস পি রাজ্য সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী বলেন, কঠিন অতিমারি এবং বর্তমান নৈরাজ্যজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে আমাদের দলের কর্মীদের আরও সচেতন, যত্নবান এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে প্রতিনিয়ত আমাদের মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আক্ষরিক অর্থে আমরা শূন্য হলেও বামপন্থীরা কখনও হারিয়ে যায় না। কালিয়াগঞ্জে ষাট সত্তরের দশকে যেভাবে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে কম. অমল সেন, কম. শান্তি কর, কম. অনন্ত সিনহা, কম. অমল জোয়ারদার প্রমুখ আর এস পি'র কর্মকান্ড সংগঠিত করেছিলেন, তা কমরেডদের স্মরণ করিয়ে দেন।

সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই জেলায় প্রথম সফর হলেও দিনাজপুরের সাথে আমার নাড়ির টান। তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান আর এস পি নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের পূণ্যভূমি এই জেলা। কিন্তু ২০১১ সালের পর থেকে আমরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছি কারণ দীর্ঘদিন সরকারে থাকায় আমরা সবাই কম বেশি আন্দোলন বিমুখ হয়ে পড়েছিলাম। প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে মানুষের দূরত্ব বেড়েছে। আমরা অবশ্যই সরকারে ছিলাম। সাফল্যের ক্ষেত্রে যেমন কৃতিত্বের ভাগ আমাদের, ঠিক তেমনি ব্যর্থতার দায়ও আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনো দলের ওপর এককভাবে ব্যর্থতার দায় চাপিয়ে দোষারোপ করলে আমরা অব্যাহতি পাবো না।

বস্তুগত বিশ্লেষণে একসময়ে বামফ্রন্ট সরকারের অনেক সিদ্ধান্তে আমাদের দল সহমত পোষণ করে নি। কিন্তু বাম সরকারের ঐতিহাসিক সাফল্যগুলিও ছোট করে দেখা ঠিক নয়। একটা সময়ে ভুল ত্রুটি নিশ্চয়ই হয়েছিল। কিন্তু নানা ধরনের আজগুবি অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে এবং বামফ্রন্ট সরকারের বেশ কিছু ভুল ত্রুটির কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি নীতি-আদর্শ বর্জিত দল রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আসীন হয়।

হয়তো অনেক আশা নিয়ে মানুষ নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু বাস্তবে সারা রাজ্যের মানুষ আজ অসহায় জীবন জীবিকা দুর্বিষহ বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। করোনা অতিমারি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আসল চেহারা। সর্বাংশে ব্যর্থ একটি রাজ্য সরকার মিথ্যা প্রচার এবং প্রতিনিয়ত মানুষকে বিভ্রান্ত করে জনসমর্থন আদায় করে নিচ্ছে। তারপর গোদের উপরে বিষ ফোঁড়ার মতো একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দল ভারতবর্ষ পরিচালনা করছে। ধর্মের নামে জিগির তুলে মানুষে মানুষে বিভাজন করছে। এটা দেশের জন্য ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

বর্তমানে অতি জটিল হয়েছে বিশ্ব পুঁজিবাদের সংকট। এদেশেও তার লক্ষণগুলি স্পষ্ট। এদেশের জনজীবন কঠিন সমস্যায় বিধ্বস্ত হচ্ছে। মার্কসবাদ লেনিনবাদ আশ্রিত একটি রাজনৈতিক দল কখনোই সচেতন ও সক্রিয় কর্মীবাহিনী ছাড়া চলতে পারে না। আর এস পি'র সর্বস্তরে চেতনার বিস্তার না ঘটাতে পারলে বর্তমান সংকট থেকে মুক্তির পথ সন্ধান অসম্ভব।

পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমাদের আরও বেশি সজাগ থাকতে হবে। প্রতিদিন যেভাবে ডিজেল, পেট্রোলের দাম বাড়ছে তাতেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। কৃষকবিরোধী কৃষি আইনগুলি বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবনধারণ এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াই আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। এই সঙ্কটময় সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি করোনা অতিমারি সম্পর্কেও মানুষকে সচেতন ও সাবধান করতে হবে।

কম. মনোজ ভট্টাচার্য আগামী ২৬ নভেম্বর আর এস পি'র একক উদ্যোগে দিল্লিতে গণবিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদী আন্দোলন সফল হবে।

জেলা সাংগঠনিক কর্মশালা

২৪ অক্টোবর চুঁচুড়া পৌর হলে জেলা সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আর এস পি হুগলী জেলা কমিটির সদস্য ও গণসংগঠনের নেতৃত্বদের নিয়ে এই কর্মশালা হয়। প্রতিনিধিরা সাংগঠনিক নানা দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েও বিশদে আলোচনা করেন। কর্মশালায় সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি আগামী ২৬ নভেম্বর সংসদ অভিযানকে কেন্দ্র করে প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়।

বোলপুরে রাজ্য কমিটির অন্যতম নেতা কম. মীর জুলফিকার আলির স্মরণসভা

গত ১১ অক্টোবর '২১ আর এস পি'র রাজ্য কমিটির সদস্য এবং বীরভূম জেলার সংগ্রামী নেতা কম. মীর জুলফিকার আলি (কম. মুরশেদি) দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসন যে অজস্র বাম কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন ও মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে ঘর ছাড়া করেছে, কম. মীর জুলফিকার আলি বীরভূম জেলার নানুর অঞ্চলে, তার মধ্যে অন্যতম। শত অত্যাচার ও ভয় দেখানোতেও কখনও মুরশেদি মাথা নত করেন নি। তৃণমূলী দুর্বৃত্ত নেতাদের সঙ্গে আপস করেন নি।

রাজ্য ও দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়ার আবহে বীরভূমের লালমাটির সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে, প্রথমে ছাত্র রাজনীতি ও পরবর্তীকালে সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভার নেতৃত্বে থেকে দলের আদর্শে দৃঢ় প্রত্যয়ী কম. মুরশেদির মৃত্যু রাজ্য-সংগঠনের কাছে অপূরণীয় ক্ষতি।

নিতান্ত বাধ্য হয়েই যখন প্রতিনিয়ত কলকাতায় থেকে হাইকোর্টে বার বার জামিনের আবেদন করছিলেন তখনও কিন্তু প্রতিদিন জেলার ছাত্র-যুব কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিলেন। কম. মুরশেদির ত্যাগ, দুঃসাহস, আদর্শ রূপায়ণের নিষ্ঠা জেলা সহ রাজ্যের বর্তমান প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। নবীন কর্মীদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা, সহজ সরল বিনীত ব্যবহার ও জীবনচর্যা এবং গণআন্দোলনের নেতৃত্বে উঠে আসা, বর্তমানে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হলেও, অবশ্যই অনুশীলনযোগ্য নিদর্শন।

গত ২৪ অক্টোবর '২১ বোলপুর শহরে প্রিয়বান্ধব অনুষ্ঠান ভবনে, বীরভূম জেলা কমিটির উদ্যোগে সকাল ১১টায় মীর জুলফিকার আলির (মুরশেদি) স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় জেলার দূরদূরান্তের লোকাল কমিটির সদস্য ও সমর্থকরা তাঁদের প্রিয় কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন।

এক মিনিট নীরবতা পালন এবং কম. মুরশেদির প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জেলা সম্পাদক কম. নিরঞ্জন মন্ডল। কম. মন্ডল মুরশেদির সমস্ত ধরনের সংস্কারমুক্ত, বিপ্লবী চেতনা ঋদ্ধ পারিবারিক-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনচর্যার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি শাসকদলের এই ক্রমাগত নিপীড়নের থেকে কম. মুরশেদিকে মুক্ত করতে পারেন নি বলে সাংগঠনিক ব্যর্থতা স্বীকার করেন। মুরশেদি আজ অসময়ে চলে গেলেও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, শৃঙ্খলাপালনের দায়বদ্ধতা এবং দুঃসাহস আগামীদিনে দলীয় কর্মীদের সাহস যোগাবে, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে প্রেরণা দেবে বলে বিশ্বাস করেন জেলা সম্পাদক।

কম. মুরশেদির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জেলা পি এস ইউ'র সম্পাদক মীর আজমীর আলি কিভাবে মুরশেদি তাঁকে দলীয় কর্মীরূপে গড়ে তোলেন, গণসংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতেন, বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তা স্মৃতিচারণ করেন। নানুর জোনালে কিভাবে কম. মুরশেদি অবিসংবাদিত বাম নেতা হয়ে ওঠেন এবং শাসকদলের দুর্বৃত্ত নেতৃবৃন্দের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন সেই বিষয়গুলিও তুলে ধরেন। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানুরে দলের সাফল্য এবং বিরোধী শক্তিগুলির আগ্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মুরশেদির নেতৃত্বে অঞ্চলে শক্ত সাংগঠনিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

এরপর একে একে স্মৃতিচারণ করেন কম. তুষার কান্তি ব্যানার্জী, কম. হাফিজুর রহমান, কম. মহুয়া মজুমদার (ব্যানার্জী), কম. রঞ্জিত প্রামাণিক, কম. রামরতন ভট্টাচার্য, কম. রঞ্জিত মজুমদার, কম. সিরাজুল ইসলাম মণ্ডল এবং প্রবীন নেতা কম. তপন হোড় ও পার্থসারথি দাশগুপ্ত। কম. মুরশেদির মতো কম. রঞ্জিত মণ্ডলকেও দীর্ঘ তিন বছর এলাকা ছাড়া হতে হয়েছিল। তিনি মুরশেদির মানসিক যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির শরিক। রঞ্জিত জানান যে, কম. মুরশেদি ১৯৮০ সালে নবসা হাই মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক পাশ করে খুজটিপাড়া কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। ১৯৯৮ সালে কম. ফজলুল হকের হাত ধরেই তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। প্রতিক্রিয়ার সময়েও এলাকায় শক্তভাবে দলের হাত ধরতে শিখিয়েছিলেন কম. মুরশেদি।

প্রিয়তম সহযোদ্ধাকে অকালে হারিয়ে প্রত্যেকেই কম. মুরশেদির রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সাহচর্য ও সখ্যের আবেগঘন স্মৃতিচারণ করেন। প্রত্যেকেই স্মৃতিচারণ করেন দীর্ঘদিন ঘরছাড়া মুরশেদি, এলাকার মানুষের কাছাকাছি পৌঁছুবার জন্যে উদগ্রীব থাকতেন। দৈনন্দিন লড়াই-এর সঙ্গে না থাকার ফলে জীবনকালের শেষ কয়েক মাস ভীষণই মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতেন। প্রতিটি কর্মীই মনে করেন শাসকের অত্যাচারে মুরশেদিকে শহিদ হতে হল।

কোন্নগরে শারদোৎসবে বুকস্টল

আর এস পি'র পক্ষ থেকে শারদোৎসব উপলক্ষে কোন্নগরের নবগ্রামে বুকস্টলের আয়োজন করা হয়। দলের প্রবীণ নেতা কম. সুপল দাশগুপ্ত ১১ অক্টোবর এই স্টলের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং, কম. পিনাকী মুখার্জী, কোন্নগর লোকাল সম্পাদক কম. ভবতোষ ঘোষ, কম. চম্পা বসাক, কম. শঙ্কর চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। ১১ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই স্টল চলে।

নদীয়া জেলা জুড়ে আর এস পি'র কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গে শারদীয় উৎসবের আবহের মধ্যেও মানুষের জীবনের বিভিন্ন বাস্তব সমস্যা নিয়ে আর এস পি'র রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, কল্যাণী, শান্তিপুর সহ নদীয়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রাণাঘাট শহর ও রামনগর ১ পঞ্চায়েতের আঁইশমালি—এর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী চূর্ণী নদীর সেতুর সংস্কার, ৩৪ নং জাতীয় সড়ক মেরামতির জন্য প্রামাণিক মোড়ে বিক্ষোভ ও মহকুমা প্রশাসকের নিকট ডেপুটেশন, জনস্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্বে থাকা পাম্প অপারেটরদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

জনজীবনের বিভিন্ন দাবিতে কল্যাণী বিডিও-র নিকট ডেপুটেশন, ধর্মীয় মৌলবাদ-এর আগ্রাসন রোধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত হয়। শান্তিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত সি পি আই (এম) প্রার্থীর সমর্থনে বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অংশে প্রচার ও সভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৬ নভেম্বর ২০২১ আর এস পি-র ডাকে ভারত বাঁচাও দিবস ও দিল্লি অভিযান নিয়ে নানা ধরনের প্রচার আন্দোলন চলছে। বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন আর এস পি নদীয়া জেলা সম্পাদক কম. শঙ্কর সরকার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. সুবীর ভৌমিক, কম. রাহুল মুখার্জি, কম. সমীর দাস, কম. ত্রিদিবেশ ভট্টাচার্য, কম. হরিহর রায়, সংযুক্ত কিষাণ সভার জেলা সম্পাদক কম. শিশির দত্ত, পি এস ইউ রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহঃ সফিউল্লা, পি এস ইউ রাজ্য নেতা কম. রুবেল শেখ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির কথা উল্লেখ করেন। পেট্রোল ডিজেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, বেকার সমস্যার দুর্বিষহ অবস্থা, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য মানুষের নাগালের বাইরে, শ্রম আইন ও কৃষি আইন সহ জনবিরোধী সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে মানুষের যখন নাজেহাল অবস্থা এবং এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ যখন চরমে, তখন কি কেন্দ্র কি রাজ্য কোনো সরকারই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে নজর না দিয়ে নানাবিধ ছলাকলার আশ্রয় গ্রহণ করছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি বেসরকারিকরণ করে আত্মনির্ভরশীলতার গল্প শোনানো হচ্ছে। সরকার মানুষের স্বার্থবাহী কি কাজ করছে তা সঠিকভাবে সামনে না এনে কেন্দ্র ও রাজ্য নিজেদের মধ্যে লোক দেখানো বাদানুবাদে ব্যস্ত। ঐক্যবদ্ধ সঠিক আন্দোলনের মাধ্যমেই এর থেকে পরিত্রাণ সম্ভব। বিধানসভায় সাধারণ মানুষের কথা তুলে ধরার জন্য উপনির্বাচনে বিভিন্ন কেন্দ্রে আর এস পি সহ বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

আর এস পি পানিহাটি লোকাল কমিটির উদ্যোগে বুকস্টল

বিগত ৪৩ বছরের মতো এবারও আগরপাড়ার বটতলায় আর এস পি'র পানিহাটি লোকাল কমিটির উদ্যোগে শারদোৎসবের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী বুকস্টল সংগঠিত করা হয়েছিল।

ঐতিহ্যবাহী এই বুকস্টলে প্রতিবারের মতই ক্রান্তি শিল্পী সংঘ, পি এস ইউ, আর ওয়াই এফ, নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের কর্মীরা উৎসাহের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। দলীয় পত্রপত্রিকা সহ মার্কসবাদী সাহিত্যে সজ্জিত এই পুস্তক বিপণিতে আগরপাড়া-পানিহাটি অঞ্চলের বাম সমর্থক সহ এতদঞ্চলের নাগরিকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। সোদপুর-পানিহাটি অঞ্চলসহ সন্নিহিত অঞ্চলেরও অনেক কর্মী সমর্থক পুস্তক বিপণিতে উপস্থিত হয়েছেন।

দমদমে শারদ সন্ধ্যায় বুকস্টল

আর এস পি দমদম (দক্ষিণ) লোকাল কমিটির উদ্যোগে সপ্তমী থেকে নবমী এই তিনদিন নাগেরবাজার সাতগাছি মোড়ে শারদীয় বুকস্টল অনুষ্ঠিত হলো। বহু বছর বাদে দলের এই উদ্যোগকে এলাকার মানুষ আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

অনেক বামকর্মী ও নেতৃত্ব স্টলে এসে বই দেখেছেন ও সংগ্রহ করেছেন। বহু মানুষ দলের পুরোনো অমূল্য পুস্তকের খোঁজ করেছেন। স্টলে দলের সভ্য সমর্থকদের উপস্থিতি সকলের নজর কেড়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও অসুস্থতাকে দমিয়ে রেখে মানসিক দৃঢ়তায় ভরপুর ৯১ বছরের বর্ষীয়ান কম. মিহির সেনগুপ্তের পরপর তিনদিনের উপস্থিতি বুকস্টলের এক বিশেষ মাত্রা জুগিয়েছে এবং তা নবাগত সাথীবৃন্দের উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। স্টলে উপস্থিত অনেকের মধ্যে ছিলেন কম. মাধুরী লোধ, কম. পূর্ণিমা মুখার্জী, কম. মাধবী দাস, কম. প্রশান্ত মাহাতো, কম. রবি শেঠ, কম. অসীম কুণ্ডু, কম. শুভদীপ মজুমদার, কম. কাজল দে, কম. মিহির পাল, কম. বিশ্বজিৎ দাস, কম. বিশ্বনাথ দত্তচৌধুরী ও কম. সনৎ ঘোষ।

হুগলী জেলায় ডেপুটেশনের কর্মসূচি

রাজ্য কমিটির কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার বিভিন্ন ব্লকে আর এস পি'র পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ৮ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া ব্লকে কোভিড বিধি মেনে জমায়েতের মাধ্যমে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন কোন্নগর লোকাল সম্পাদক কম. ভবতোষ ঘোষ, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. পিনাকী মুখার্জী, কম. সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, কম. শুভাশিষ সিনহা প্রমুখ। ৩ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর এস ডি ও'র কাছে স্মারকলিপি প্রদানে নেতৃত্ব দেন কম. সত্যজিৎ দাশগুপ্ত, কম. শঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ।

২২ সেপ্টেম্বর চণ্ডীতলা ২ ব্লকে প্রতিনিধি আকারে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর খানাকুল ১ ব্লকে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কম. যাদব বাগ। জমায়েতের কর্মসূচি থাকলেও কন্টেইনমেন্ট জোন হওয়ায় সেখানে জমায়েত করা সম্ভব হয় নি। ডেপুটেশনগুলিতে রাজ্যের দাবি দাওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়। শ্রীরামপুরে কারা রেশন কার্ড পাচ্ছেন না, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পাচ্ছেন না, ভাতা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের নামের তালিকা দেওয়া হয়। খানাকুলে তাঁত শ্রমিকদের সমস্যার প্রেক্ষিতে তাঁদের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্রও স্মারকলিপির সঙ্গে দেওয়া হয়। প্রতিটি ডেপুটেশনেই আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন এবং দাবিগুলির সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

হুগলী জেলার নিম্ন দামোদর উপত্যকায় এক মাসের মধ্যে দু'বার বন্যা হওয়ায় কৃষি অর্থনীতি চরম বিপর্যস্ত। বন্যার স্থায়ী প্রতিরোধে পরিবেশ বান্ধব বিকল্প উন্নয়ন নীতির দাবি জানিয়ে আর এস পি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে গত ৪ অক্টোবর প্রতিনিধি আকারে জেলাশাসক, আরামবাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং, কম. অরুণ দাস ও কম. চম্পা বসাক। লোকশিল্পীদের ভাতা নিয়ে বঞ্চনার প্রতিবাদে গত ২০ সেপ্টেম্বর জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন কম. কিশোর সিং। রেশন কার্ড নিয়ে অনিয়মের প্রতিবাদে গত ৩ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুর মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। রেশন কার্ডে বঞ্চিত মানুষের নামের তালিকা দিয়ে তাদের রেশনকার্ড দ্রুত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কম. শঙ্কর চক্রবর্তী।

পশ্চিমবঙ্গ কেমন আছে?

জানবার কথা

২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ৫৮টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এমন বহু দল নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করে যাদের নাম ইতিপূর্বে শোনাই যায়নি। সর্বমোট ২১৩০ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রথম পর্যায়ে ১৯১ জন, দ্বিতীয় ১৭১, তৃতীয় ২০৫, চতুর্থ ৩৭২, পঞ্চম ৩১৮, ষষ্ঠ ৩০৬, সপ্তম ২৮৪, অষ্টম ২৮০ জন প্রার্থী ছিলেন। সমস্ত পর্যায় মিলিয়ে ৬০৮ জন নির্দল প্রার্থী ছিলেন।

● **অপরাধী বলে অভিযুক্ত :** এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীদের মধ্যে ৫২৮ জন (২৫ শতাংশ) নিজেদের বিরুদ্ধে থাকা ফৌজদারি মামলার বিষয় উল্লেখ করেছেন। ২০১৬ সালে ১৯৬০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৫৪ (১৮ শতাংশ) জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল।

● **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** ৯৯৬ জন (৪৭ শতাংশ) প্রার্থী জানিয়েছেন যে, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। ১০৭২ জন (৫০ শতাংশ) ঘোষণা করেছেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা তার বেশি। ২৫ জনের ডিপ্লোমা আছে। ২৭ জন প্রার্থী শুধুমাত্র স্বাক্ষর এবং ১০ জন নিরক্ষর।

● **বয়স :** ৬৬০ জন (৩১ শতাংশ) প্রার্থী জানিয়েছেন যে তাঁদের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। ১১১০ জন (৫২ শতাংশ) প্রার্থীর বয়স ৪১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। ৩৫৯ জন (১৭ শতাংশ) প্রার্থীর বয়স ৬১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে। একজন প্রার্থীর বয়স ৮৯ বছর।

● **লিঙ্গ সাম্যতা :** ২০২১-এ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে মোট ২৪০ জন (১২ শতাংশ) মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ২০১৬ সালের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি।

পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের (বিধায়কদের) অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

● ২০১৬'র বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট গড় সম্পদ ছিল ১.৩৮ কোটি টাকা। ২০২১'র নির্বাচনে এই ২১০ জন পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিধায়কদের গড় সম্পদ বেড়ে হয়েছে ২.৪৬ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে এদের গড় সম্পদ বৃদ্ধি ১.০৭ কোটি টাকা। বিধায়কদের গড় সম্পদ বৃদ্ধি ৭৮ শতাংশ।

সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রথম পাঁচজন

পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিধায়কের নাম

● **তৃণমূল কংগ্রেসের জাকির হোসেন** ঘোষণা করেছেন—২০১৬ সালে তাঁর সম্পদ ছিল ২৮.০৪ কোটি টাকা। ২০২১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬৭.০২২ কোটি টাকা।

● **তৃণমূল কংগ্রেসের আহমদ জাভেদ খানের** সম্পদ ছিল ১৭.২৯ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে ১৫.০৩ কোটি টাকা বেড়ে হয়েছে ২০২১ সালে ৩২.৩৩ কোটি টাকা।

● **তৃণমূল কংগ্রেসের ফিরহাদ হাকিমের** মোট সম্পদ পাঁচ বছরে বেড়েছে ৭.৩৬ কোটি টাকা। ৫.৯৭ কোটি টাকা থেকে ১৩.৩৪ কোটি টাকা।

● **তৃণমূল কংগ্রেসের সুব্রত সাহার** সম্পত্তি ১.৬৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.০২ কোটি টাকা। পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.৩৭ কোটি টাকা।

● **বিজেপি'র সব্যসাচী দত্ত** (এখন আবার তৃণমূল কংগ্রেস-এ ফিরে এসেছেন) ২.৩৫ কোটি টাকা থেকে ৫.৩৯ কোটি টাকা পাঁচ বছরে বেড়ে হয়েছে ৭.৭৫ কোটি টাকা।

● ২০২১'র নির্বাচনে বিজয়ী ২৯২ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৫৮ জন নতুন বিধায়ক কোটিপতি। ২০১৬ সালে ছিল ৩৪ শতাংশ।

● **তৃণমূল কংগ্রেসের ২১৩ জন বিজয়ী বিধায়কের মধ্যে ১৩২ জন (৬২ শতাংশ) কোটিপতি।** বিজেপি'র ৭৭ জনের মধ্যে ২৫ জন (৩৩ শতাংশ) এবং একজন নির্দল প্রার্থীর ১ কোটি টাকার বেশি সম্পদ রয়েছে।

● **গড় সম্পদ :** বিধানসভা নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীদের গড় সম্পদ ২.৫০ কোটি টাকা। ২০১৬ সালে ছিল ১.৪৬ কোটি টাকা।

● **বিজয়ী প্রার্থীদের মাথাপিছু গড় সম্পদ :** বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ২১৩ জন বিজয়ীর গড় সম্পদ ২.৯৮ কোটি টাকা এবং ৭৭ জন বিজয়ী বিজেপি বিধায়কের গড় সম্পদ ১.১৩ কোটি টাকা। এই ৭৭ জন বিজয়ী বিজেপি বিধায়কের মধ্যে এখনও পর্যন্ত পাঁচজন তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন।

তথ্যসূত্র :— ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন ওয়াচ ও এ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর পুস্তিকা।

Vol. 68 Issue No. 37 শনিবার ৬ নভেম্বর ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না...

সৌম্য শাহীন

"এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না
এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না
এই বিস্তীর্ণ শ্মশান আমার দেশ না
এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না"।

বাংলাদেশ আবার মৌলবাদী হামলায় রক্তাক্ত। শারদোৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলোয় সেদেশের হিন্দুদের জন্য চরম বিভীষিকা নেমে এলো। সেখানকার বন্ধুদের কাছে যেটুকু খবর পেলাম, তাতে মনে হচ্ছে কুমিল্লা জেলার নানুয়ায় এক পূজামণ্ডপে কোরান শরীফের অবমাননা করা হয়েছে বলে গুজব রটিয়ে যেভাবে পূজামণ্ডপে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়েছে, তার পিছনে গভীর রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। অতীতেও বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নানা রটনা ছড়িয়ে দিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ওপর হামলা করা হয়েছে। এবারও নৈরাজ্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পরিকল্পিতভাবেই পূজামণ্ডপে হামলা করা হয়েছে।

এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) এবং শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল সহ বাংলাদেশের প্রতিটি মার্কসবাদে প্রত্যয়ী দল ও গণসংগঠন। সেদেশের প্রগতিশীল মানুষ মানবতার বিরুদ্ধে, এই চরম অপরাধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন, সংহতি জানাচ্ছেন আক্রান্ত হিন্দুদের প্রতি। উপমহাদেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন।

এবছরের দুর্গাপুজোর সময়ের হিংসার ঘটনা বহুল প্রচারিত হলেও বিগত কয়েক বছর ধরেই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ঘটছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীতে সংবিধান পরিবর্তন করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই বহুত্ববাদী চেতনাকে হত্যা করেন সামরিক শাসক হুসেন এরশাদ। গত তেরো বছর বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় রয়েছে মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। দুঃখের কথা, সে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই সময়কালে বারবার আক্রান্ত হয়েছে, বিরোধী বিএনপির নেতৃত্ব কার্যত গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন। এরই পাশাপাশি ইসলামিক মৌলবাদ সরকারের পরোক্ষ মদতে তার শিকড় বিস্তার করে চলেছে।

হিন্দুদের ওপর ঘটে যাওয়া আক্রমণকে সরকার বিএনপি-জামাতের ষড়যন্ত্র বলে প্রচার করছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সাথে এ ব্যাপারে হাসিনার আওয়ামী লীগের মিলটা বড়ই প্রকট হয়ে পড়ে—এভাবেই ধুলাগড়, দেগঙ্গা, আসানসোলে দাঙ্গার পরে বিজেপি জুজু দেখিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যালঘুদের ভোট এককাট্টা করেছিলেন। প্রথমে দাঙ্গা হতে দিয়ে এবং তারপরে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে সেই দাঙ্গাকে রুখে দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশ্নহীন আনুগত্য এবং সমাজের প্রগতিশীল অংশের হাততালি—দুটোই অর্জন করেন আমাদের রাষ্ট্রনেতারা। লেসার ইভিল তত্ত্বের আড়ালে সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তাহীনতাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের নানাবিধ ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, বৈষম্য, দুর্নীতি থেকে জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে দাঙ্গার এই বহুল ব্যবহার উপমহাদেশের রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই প্রসঙ্গে হেফাজতে ইসলামের কথা না বললেই নয়। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হিসেবে হেফাজতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে ২০১০ সালের ১৯ জানুয়ারি। সংগঠনটি যে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সারা বাংলাদেশের চোখ ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দিকে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার দায়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০১০ সালের ২৫ মার্চ ট্রাইব্যুনাল, আইনজীবী প্যানেল ও তদন্ত সংস্থা গঠন করা হয়। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের সংগঠন জামায়াতে ইসলাম সে সময়ে প্রবল সংকটে পড়েছিল। সেখান থেকে তাদের উদ্ধারের জন্যই গঠিত হয়েছিল হেফাজতে ইসলাম। সাংগঠনিক ব্যয়নির্বাহ, মৌলবাদের তাঁবেদারি ও ধর্মকে উগ্রপন্থার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রগতিশীল মানুষ হত্যার যে নীলনকশা হেফাজতে ইসলাম কায়েম করেছে, তার রাজনৈতিক কায়দা ও ভাষা সবই জামায়াতে ইসলামের তৈরি। অথচ এক সময়ে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা এই যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলাম ও ছাত্রশিবিরকে প্রতিহত করেছিল।

শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলনের সময়ে হেফাজতে ইসলাম ঢাকা শহর অবরোধ করে এবং সরকারের কাছে ১৩ দফা দাবি পেশ করে। সেই থেকে সরকার ও হেফাজতের মধ্যে রাজনৈতিক আঁতাত চলছে। হেফাজতকে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি অনুদান হিসাবে দিয়েছে আওয়ামী লিগ সরকার এবং তাদের দাবির উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের সংস্কার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি হেফাজতকে খুশি করতে বলেছেন, নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মদিনা সনদ অনুযায়ী দেশ চলবে। বর্তমানেও বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে যার কোনওটিরই বিচার হয়নি। ফলে শাসকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রশ্রয়েই সে দেশে বারবার সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটছে।

ভারতীয় রাজনীতিতে অভিঘাত :

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর এই আক্রমণের ঘটনা ভারতবর্ষে ইসলামফোবিয়া তৈরি করার কাজে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। শুভেন্দু অধিকারীর মতো বিজেপি নেতা ইতিমধ্যেই এই নৃশংস ঘটনা থেকে নির্বাচনী ফায়দা তোলার হিসেব কষতে শুরু করেছেন। ত্রিপুরার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনেও পার্শ্ববর্তী জেলা কুমিল্লার ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে বলেই রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ইতিমধ্যেই সেখানে মসজিদ ভাঙচুর শুরু হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, এর আগেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের আগে মুজফ্ফরনগর, পাঠানকোট, পুলওয়ামায় ঘটে যাওয়া সন্ত্রাস বিজেপির নির্বাচনী পালে হাওয়া দিয়েছিল। যদিও কোনো ঘটনাতেই মূল ষড়যন্ত্রীদের কোনো সাজা হয়নি, যা অবশ্যই আমাদের সন্দেহ উদ্রেক করে।

তৃণমূলের নরম হিন্দুত্ব :

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপি পরাস্ত হলেও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজ্যের ৩৮ শতাংশ ভোটার তাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম আইনসভা গঠিত হয়েছে বামপন্থীদের কোনোরকম প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই। উত্তর ভারতে যখন কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলন কার্যত ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের চেহারা নিচ্ছে, তখন আমাদের রাজ্যে বিজেপি বিরোধিতার এজেন্সি নিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা জয়ের পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাখির চোখ এখন দিল্লীর মসনদ। এই লক্ষ্যে সফল হওয়ার জন্য তাঁর স্ট্র্যাটেজি দ্বিমুখী। একদিকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সম্প্রসারণ, অন্যদিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদ বিরোধী সংখ্যাগুরু সমাজের আস্থা অর্জন করা। সেই লক্ষ্যে ত্রিপুরা, অসম, গোয়ার মতো রাজ্যে বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নেতাকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করানো হলো সম্প্রতি, অন্যদিকে মুকুল রায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বঙ্গ রাজনীতির জনপ্রিয় নেতারা বিজেপি থেকে ফিরলেন তৃণমূলে।

একই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বিধানসভায় জন্মাষ্টমীর পুজো হচ্ছে, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের নাম রাখা হচ্ছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', ঈদের বাজারে র‍্যাফ নামিয়ে মুসলমানকে পেটানো হলেও অতিমারীর ভ্রুকুটিকে অগ্রাহ্য করে তৃণমূলের ছোট-বড়-মেজো-সেজো নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিপুল সমারোহে দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এমনকি পদ্মের বন থেকে জোড়া ফুলের বাগানে স্বচ্ছন্দে উড়ে আসছেন বাবুল সুপ্রিয়র মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদী নেতা, যার দুই হাত আজও আসানসোল দাঙ্গার শোণিতে রক্তাক্ত। কংগ্রেস বা বামফ্রন্টের শাসনকালে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পৃথকীকরণ ছিল, সেই ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্য আজ ভূলুণ্ঠিত। উল্টে হিন্দুত্ববাদের স্বাভাবিকীকরণ হয়ে উঠছে ভারতীয় তথা বঙ্গীয় রাজনীতির নিউ নর্মাল।

অবাক কবার বিষয়, তথাকথিত লিবারেল বামপন্থীদের একাংশ এই প্রবণতার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু তো দেখতে পাচ্ছেনই না, উল্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নরম হিন্দুত্বের রাজনীতির মাধ্যমে বিজেপিকে আটকানোর খোয়াব দেখছেন তাঁরা। মজার কথা, তৃণমূলের নির্বাচনী জয়ে আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত প্রকাশ্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, প্রতিদানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর এস এসকে দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আসলে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে সরকারের সঙ্গে সংঘের দূরত্ব বেড়েছে।

বহুজাতিক করপোরেশনগুলির করায়ত্তে থাকা মোদী-শাহ জুটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রাজনৈতিক এজেন্ডার বদলে লগ্নিপুঁজির স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। তার তুলনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সংঘের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিকে পুষ্টি জোগাচ্ছে। আদিবাসী ও মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে সংঘের শাখার সংখ্যা বিগত কয়েক বছরে চোখে পড়ার মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এস এসের একাংশ মনে করেন যে প্রস্তাবিত ফেডারেল ফ্রন্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলে সেটা মোদী-শাহ জুটিকে চাপে রাখতে সহায়ক হবে। ফলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যারাই জয়লাভ করুক না কেন, রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি থাকবে সংঘের হাতেই।

এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তাই একটা কথা অনস্বীকার্য—আধুনিক ভারতবর্ষে ফ্যাসিবাদ আর শুধুমাত্র বিজেপি'র ভরসায় বসে নেই। বুর্জোয়া আঞ্চলিক দলগুলোতেও ফ্যাসিবাদী শক্তি ক্রমশ শিকড় বিস্তার করেছে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প রাজনৈতিক ভাষ্য তৈরি করার দায় বামপন্থীদেরই। ফ্যাসিস্ট শক্তির বিষাক্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের মতাদর্শগত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই যুদ্ধে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শামিল করতে হবে।

সংখ্যালঘু মৌলবাদের বিপদ :

বিধানসভা নির্বাচনে আই এস এফকে সঙ্গে নিয়ে সংযুক্ত মোর্চা গঠনকে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে নির্বাচনের আগে ও পরে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহল থেকে সংখ্যালঘুদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করার অভিযোগ উঠেছে। আই এস এফের প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকীর জঘন্য সাম্প্রদায়িক ওয়াজের একটি ভিডিও সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তিনি কোরানের অবমাননায় যুক্ত ব্যক্তিদের শিরশ্ছেদ করার নিদান দিয়েছেন। অতীতে যখন নবীর অবমাননা করা হয়েছে, এই ছুতোয় ফ্রান্সের এক শিক্ষককে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছিল, তখনও আব্বাস অনুরূপ কথা বলেন। পরবর্তীকালে আইএসএফের সঙ্গে বামপন্থীদের নির্বাচনী জোট হওয়ার পরে তিনি প্রকাশ্যে নিজের বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

পীরজাদা আব্বাসের রাজনৈতিক বক্তৃতায় শোষিত নিপীড়িত খেটে খাওয়া মানুষের কথা সচেতনভাবেই উঠে আসছিল, কারণ তার সমর্থনের ভিত্তি মূলত কৃষিজীবি বাঙালি মুসলমান। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি, দেশব্যাপী চলমান কৃষক আন্দোলনে হরিয়ানা-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের খাপ পঞ্চায়েতগুলো কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সেই পিতৃতান্ত্রিক ভাবনায় জারিত খাপ পঞ্চায়েত, যারা তাঁদের উগ্র ও পশ্চাৎমুখী সংস্কৃতি ও কাজের জন্য "কুখ্যাত"। ২৬শে জানুয়ারি লালকেল্লার ঘটনার পর যখন সমগ্র সরকারি ও কর্পোরেট প্রচারযন্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে চাষীদের "দেশদ্রোহী" প্রমাণের কাজে, তখন বি কে ইউ-এর নেতা রাকেশ টিকায়েতের কান্না লক্ষ লক্ষ জাঠ কৃষককে ঐক্যবদ্ধ করেছে। মুজাফফর নগর দাঙ্গায়, এই রাকেশ-নরেশ ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যক্কারজনক ভূমিকা ছিল। কার্যত বিজেপির হাতের পুতুল হয়ে জাঠ কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পাঁচিল তোলার কাজ করেছিলেন তাঁরা। আজ সেই রাকেশ টিকায়েত ফ্যাসিবাদী সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, কৃষক আন্দোলনের একজন সর্বজনস্বীকৃত আইকন হয়ে উঠেছেন। একই কথা প্রযোজ্য আব্বাস সিদ্দিকীর ক্ষেত্রে। ফুরফুরা শরীফের এই পীরজাদাটির রাজনৈতিক উত্থান এবং দলিত ও আদিবাসীদের নিয়ে সেক্যুলার ফ্রন্ট গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে শ্রেণি রাজনীতির এক নতুন ভাষ্য নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন বামপন্থীরা। কিন্তু আবারো সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা করে তিনি আত্মপরিচিতিসত্তার রাজনীতির সংকীর্ণ রূপকে বেআব্রু করে দিলেন।

আব্বাসের অপকর্মে বিজেপি-তৃণমূলপন্থীরা উল্লসিত। সংখ্যালঘুদের নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগে তাঁরা বামপন্থীদের বিদ্ধ করছেন। প্রথমেই যেটা বলার, সেটা হলো বামপন্থীরা শূন্য হোক আর মুছে যাক, আজও তাঁরা প্রতিবাদী মিছিল বের করছেন, বাংলাদেশের আক্রান্ত হিন্দুদের প্রতি সংহতি দেখাচ্ছেন। তবে এখানেই থেমে গেলে চলবে না, আব্বাস সিদ্দিকীর জঘন্য সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার জবাবদিহি আই এস এফের কাছে চাইতে হবে। সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া গেলে আনুষ্ঠানিক ভাবে জোট ভেঙে দেওয়া হোক (কার্যত ভেঙেই গেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ বার্তা যাওয়া দরকার)।

পরিশিষ্ট :

একটা কথা বোঝা দরকার, খেটে খাওয়া মানুষ অসহায়তা থেকে ধার্মিক হয়। তাদের যন্ত্রণার একমাত্র স্বীকৃত প্রকাশ ধর্মীয় উচ্চারণে। বুর্জোয়া শ্রেণি সেই অসহায়তাকে ব্যবহার করে, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মাধ্যমে শ্রেণি ঐক্যে ফাটল ধরায়। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গেলে দেশীয় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তাই শারদোৎসবে বামপন্থীরা বইয়ের স্টল দেয়, পীরপন্থী শ্রমজীবি মুসলমানের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বাজি রেখে ঝুঁকি নেয়। সেই চেষ্টাগুলো বিফল হলেও উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-